(ছ) কমলাদেবী: কমলাদেবী মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী। নাটকে তাঁর ভূমিকা অতি নগণ্য। তিনি রাজধরকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় তিনি রাজধরকে তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন। এই সুযোগে রাজধর তূণের তীর বদল করেন।

(জ) আরাকানরাজ: স্বাধীন ত্রিপুরার প্রতিবেশী রাজ্য আরাকানের রাজাকে বলা হয় আরাকানরাজ। নাটকে জানা যায় মহারাজ অমরমাণিক্য তাঁকে বারবার শিক্ষা দিলেও অর্থাৎ যুদ্ধে পরাস্ত হলেও তিনি ত্রিপুরা আক্রমণে নাছোরবান্দার মতো লেগেছিলেন। রাজধর তাঁকে রাতে তাঁর শিবিরে বন্দী করে। পরে রাজধরের হঠকারিতার জন্য আরাজানরাজের জয় হয়।

(ঝ) যুবরাজের মৃত্যুদৃশ্য: যুবরাজ হলেন অমর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রমাণিক্য। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে তৃতীয় অঙ্কে তাঁর মৃত্যু দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার আরাকান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান। যুদ্ধে যখন তার দেহে তীর এসে লাগে, তখন মাহুত তার হাতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালবার সময় মাহুত মারা যায় এবং যুবরাজ সে সময় হাতির উপর থেকে পড়ে যান। ইন্দ্রকুমার ও তাকে মুকুট পরিয়ে দিতে চাইলে তা ইন্দ্রকুমারকে পরিয়ে দিতে বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস অন্যান্যরা তাকে অর্জুন গাছের তলায় মৃত্যু পথযাত্রী হিসেবে দেখতে পান। রাজধর ত্যাগ করেন।

(ঞ) কর্ণফুলি: কর্ণফুলি একটি নদী। এই নদী বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। মুকুট নাটকে কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরের আরাকান রাজের পরাজয়ের নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া মুকুটটিকে পরবেন এই নিয়ে যখন বিবাদ চলে তখন সেনাপতি ঈশাখাঁ মুকুটটি কর্ণফুলির জলে ফেলে দেন। এরই প্রতিশোধ নিতে রাজধর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি ধুরন্ধরকে বলেন তার মুকুটের মতো যুদ্ধজয়কেও তিনি কর্ণফুলি নদীতে নিক্ষেপ করলেন। তাছাড়া নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যখন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য মৃত্যুপথযাত্রী তখন এই কর্ণফুলি তীরে অর্জুন বৃক্ষতলায় ইন্দ্রকুমারের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে দেখা যায়।

(ট) গোমতী: গোমতী মুকুট নাটকে উল্লেখিত ত্রিপুরা রাজ্যের একটি নদী। এই নদীতে নাকি পূর্ণিমার রাতে বাঘ জল খেতে আসে। ঈশাখাঁ ত্রিপুরারাজ অমরমাণিক্যের সেনাপতি ও রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষা দাতা গুরু। মহারাজ যখন সেনাপতি ঈশাখাঁকে পুত্রদের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেন কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর সহ সকলে পূর্ণিমার রাতে গোমতীতে বাঘ জল খেতে আসবে তখন এই বাঘটিকে শিকার করে তাদের অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শিতার প্রমাণ দিবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পরিশেষে রাজধর ছল-চাতুরীর দ্বারা মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারকে পরাজিত করেন।

মেজদিদি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

পশ্ন ১। 'মেজদিদি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

Ans:- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Q. ২। 'মেজদিদি' উপন্যাসে মেজদিদির প্রকৃত নাম কী?

Ans:- হেমাঙ্গিনী।

Q. ৩। 'মেজদিদি' কী ধরনের রচনা?

Ans:- এটি একটি উপন্যাস।

Q. ৪। 'মেজদিদি' উপন্যাস প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

Ans:- 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

Q. ৫। 'মেজদিদি' উপন্যাস কয়টি পরিচ্ছেদ আছে?

Ans:- আটটি।

Q. ৬। 'মেজদিদি'র বড় জায়ের নাম লেখো।

Ans:- কাদম্বিনী।

Q. ৯। "এ হাতির খোরাক নিত্য জোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে।"- উক্তিটি কার?

Ans:- কাদম্বিনীর।

Q. ১১। কাদম্বিনীর স্বামীর নাম কী?

Ans:- নবীন।

Q. ১২। বিপিনের স্ত্রীর নাম কী ছিল?

Ans:- হেমাঙ্গিনী।

Q. ১৪। কেষ্টর দিদির বাড়ি কোথায় ছিল?

Ans:- রাজহাটে।

Q. ১৭। কাদম্বিনীর ছেলের নাম কী?

Ans:- পাঁচুগোপাল।

Q. ১৮। কাদম্বিনীর মেয়ের নাম কী?

Ans:- পুঁটি।

Q. ১৯। হেমাঙ্গিনীর ছেলের নাম কী?

Ans:- ললিত।

Q. ২০। হেমাঙ্গিনীর মেয়ের নাম কী?

Ans:- উমা।

Q. ২১। "আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠিল।" – কার কথা বলা হয়েছে?

Ans:- কাদম্বিনীর।

Q. ২২। "মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি।" এটা কার উক্তি?

Ans:- কাদম্বিনীর।

Q. ২৩। 'বড় কুটুম যে গো। তাঁকে তার মত রাখতে হবে তো।' – বড়কুটুম কে?

Ans:- কেষ্ট।

Q. ২৪। 'মেজদিদি' উপন্যাসের কেষ্ট ধনের বৈমাত্রেয় দিদির বাড়ী কোথায় ছিল?

Ans:- বিপিন ধানের কারবার করতেন।

Q. ৩২। "তোর মেজদিদিকে তুই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই।" – কে, কার প্রতি উক্তিটি করেছে?
Ans:- বিপিন, কেষ্টর প্রতি এই অনুরোধটি করেছে।
Q. ৩৩। "আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা বলে মনে করবি।" – কে, কাকে এই কথাটি বলেছে।
Ans:- হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে এই কথাটি বলেছে।
Q. ৩৪। "ভারী আমার মাসিমার কুটুমকে ডেকে এনেছেন।' – বক্তা কে? কার প্রতি এই উক্তি?
Ans:- বক্তা কাদম্বিনীর। পাড়ার যে বুড়ো মানুষটি পথ দেখিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে আসে তার প্রতিই এই উক্তি।
Q. ৩৫। 'পৈত্রিক বাড়িটা দুইভাইয়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।' – এই দুই ভাই কে কে?
Ans:- এই দুই ভাই – নবীন ও বিপিন।
Q. ৩৬। "থাক-থাক হয়েছে ভাই – চিরজীবী হও।" – কে, কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছিলেন?
Ans:- হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন।
Q. ৩৭। "মুখের ভাব তোমার মতোই দিদি। বলি, বাপের বাড়ির কেউ নাকি ?" – কে, কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছে?
Ans:- হেমাঙ্গিনী কাদম্বিনীকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছে।
Q. ৩৮। "বড় কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত রাখতে হবে তো!' – 'বড় কুটুম' কে? – উক্তিটি কার?
Ans:- বড় কুটুম কেষ্ট। উক্তিটি কাদম্বিনীর।
Q. ৩৯। "আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।" – এই আমি কে? বিষয়টি বিস্তারিত করো।
Ans:- এই আমি হলো কেষ্ট।

একদিন সন্ধ্যার জ্বর বোধ হওয়ায় হেমাঙ্গিনী বিছানায় একা পড়ে রয়েছিলেন, তখন তিনি দেখলেন কে যেন অতি সন্তর্পণে কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে তখন হেমাঙ্গিনীর ২য় ডাকে সাড়া দিয়েছিল।
Q. ৪০। 'মেজদিদি' উপন্যাসের লেখকের নাম লেখো। মেজদিদির প্রকৃত নাম কী?
Ans:- 'মেজদিদি' উপন্যাসের লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মেজদিদির প্রকৃত নাম হেমাঙ্গিনী।
Q. ৪১। "তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্ নে যা।" – দলিতা ভুজঙ্গিনীর স্বামীর নাম কী? কাকে তিনি আসতে বারণ করলেন?
Ans:- দলিতা ভুজঙ্গিনীর স্বামীর নাম বিপিন। তিনি কেষ্টকে আসতে বারণ করলেন।
দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ
Q. ১।"বিপিনের মনে পড়িল, সেদিনও স্ত্রীর এমনি মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন, এমনি কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন।" – বিপিন কে? প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দাও।
অথবা,
সেদিনের ঘটনাটি কী? প্রসঙ্গটি বিশদ করো।
Ans:- বিপিন হলেন হেমাঙ্গিনীর স্বামী।

স্বামী বিপিনের কাছে অসুস্থ হেমাঙ্গিনী আশ্রয় ভিক্ষে চেয়েছিলেন অসহায় কেষ্টর। হেমাঙ্গিনী যখন সুস্থ হয়ে পড়ে বিপিন তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। বিপিনের এরূপ আচরণে হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। হেমাঙ্গিনী বাপের বাড়ি চলে যাবেন এমন কথা বলার পরও বিপিন তার কথায় গুরুত্ব দেননি। হেমাঙ্গিনী সত্যি সত্যি কেষ্টকে নিয়ে যখন গৃহ ত্যাগ করে তখন হেমাঙ্গিনীকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলে হেমাঙ্গিনী বললেন, কেষ্টর জন্য স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা হলেই হেমাঙ্গিনী গৃহে ফিরবেন। তখন বিপিনের মনে পড়ল, যে সেইদিনও স্ত্রীর এমনি মুখের ভাব দেখেছিলেন এবং এমন কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিলেন, যেদিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি রক্ষা করবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।
Q. ২। "এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এতবড় নির্লজ্জ অপমান মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে ইহা যেন তার মাথায় প্রবেশ করিল না।" – কে, কাকে, কীরকম আঘাত ও অপমান করেছিল? প্রসঙ্গ বিশদ করো।
Ans:- হেমাঙ্গিনীকে কাদম্বিনী জঘন্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে আঘাত ও অপমান করেছিলেন।

হেমাঙ্গিনী জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে কেষ্ট তার আরোগ্য কামনায় দোকান থেকে টাকা তিনটি নিয়ে তার গ্রামের জাগ্রত দেবী বিশালাক্ষীর পূজা দেয়। কাদম্বিনী সে কথা জানতে পেরে হেমাঙ্গিনীর বাড়িতে এসে বললেন, হেমাঙ্গিনীর মদত পেয়েই কেষ্ট চুরি করার বিদ্যা শিখেছে। তার এরূপ স্বভাব আগে ছিল না। কাদম্বিনীর এ ধরনের মিথ্যা অপবাদে হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মানুষ মানুষকে এমন কদর্য অপমান করতে পারে এমন ধারণা হেমাঙ্গিনী স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।
Q. ৩। "তোমার মর্তো নিষ্ঠুর, তোমার মতো বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই।" – কে, কাকে, কোন্ প্রসঙ্গে 'নিষ্টুর' ও 'বেহায়া' বলে উল্লেখ করেছিল? প্রসঙ্গটি বিশদ করো।
Ans:- হেমাঙ্গিনী কাদম্বিনীকে নিষ্ঠুর ও বেহায়া বলে উল্লেখ করেছিলেন।

Ans:- নবীন কেষ্ট সম্বন্ধে একথা বলেছে।

Q. ১৫। "হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য হইলেন, কারণ কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই।" – কার সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে? সে কাঁদছিল কেন?

Ans:- কেষ্ট সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে।

মা-মরা কেষ্ট হেমাঙ্গিনীকে ভীষণ ভালোবাসত। তাই হেমাঙ্গিনী জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। অসুস্থ হেমাঙ্গিনীর যদি মৃত্যু হয়ে যায় সে কথা মনে করে কেষ্ট কাঁদছিল।

Q. ১৬। "শিবুকে বলে দিস ত' উমা, ওকে না আর ঢুকতে দেয়।" – উমা কে? কাকে ঢুকতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে?

Ans:- উমা হলেন হেমাঙ্গিনীর মেয়ে। কেষ্টকে ঢুকতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

Q. ১৭। "এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান, মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে ইহা যেন তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না।" – কে, কাকে অপমান করেছে?

Ans:- হেমাঙ্গিনী কাদম্বিনীকে অপমান করেছে।

Q. ১৮। 'কেঁচো সাপের মতন চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। – কার কথা বলা হয়েছে? কার মনে বিস্ময় জেগেছিল?

Ans:- কেষ্টর কথা বলা হয়েছে। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর মনে বিস্ময় জেগেছিল।

Q. ১৯। "পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজ খুড়ীমার অসুস্থ শরীর – সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন- ও কি কম চালাক! – পাঁচুগোপাল কে? মেজ খুড়ীমার কী অসুখ করেছিল?

Ans:- পাঁচুগোপাল কাদম্বিনীর ছেলে। হেমাঙ্গিনীর বুকে সর্দি বসে গিয়েছে। তার একে তো জ্বর আর বুকে ঠাণ্ডা লেগে যায়। ফলে সে বিছানায় শয্যাশায়ী।

Q. ২০। 'পাঁচুদা তাকে নাড়ুগোপাল করে মাথায় দুটো থান ইঁট দিয়ে বসিয়ে রেখেছে।' – কার প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে? তাকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?

Ans:- কেষ্ট সম্বন্ধে এই উক্তি করা হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী অসুস্থ হলে কেষ্ট তার আরোগ্য লাভের জন্য দোকান থেকে তিন টাকা চুরি করে গ্রামের জাগ্রত দেবী বিশালাক্ষ্মীর পূজা দিতে যায়। তাঁর এই টাকা চুরির জন্য তাঁকে এই শাস্তি পেতে হয়েছিল।

Q. ২১। "যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হয়ে গেল, অকস্মাৎ তাকে সম্মুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটি তারই মাথায় গিয়ে পড়িল।" – কাকে কেন্দ্র করে বিবাদ হয়েছিল? স্বামী-স্ত্রী কারা?

Ans:- কেষ্টকে কেন্দ্র করে বিবাদ হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী হলেন বিপিন এবং হেমাঙ্গিনী।

Q. ২২। "শপথ কচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।" – কে বলেছেন? ভাই-বোন কারা?

Ans:- হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিন বলেছেন। ভাই-বোন হল কেষ্ট ও হেমাঙ্গিনী।

Q. ২৩। "তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখপানে একটি বার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্ নে যা।" – দলিতা ভুজঙ্গিনীর স্বামীর নাম কী? কাকে তিনি আসতে বারণ করলেন?

Ans:- দলিতা ভুজঙ্গিনীর স্বামীর নাম বিপিন। কেষ্টকে তিনি আসতে বারণ করেন।

Q. ২৪। 'তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকে মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তিনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? – 'নিরুপায়' শব্দটির অর্থ কী?

Ans:- তিনি বলতে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীকে বোঝানো হয়েছে। 'নিরুপায়' শব্দটির অর্থ যার কোন উপায় নেই।

Q. ২৫। 'মেজদিদি' উপন্যাস অবলম্বনে মেজদিদি ও তাঁর জায়ের নাম লেখো।

Ans:- মেজদিদির নাম হেমাঙ্গিনী ও তার জায়ের নাম কাদম্বিনী।

Q. ২৬। "বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, তুমি যা চাও তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠো।" – উদ্ধৃতিটি কোন্ পাঠের অন্তর্গত? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছে বিপিন?

Ans:- উদ্ধৃতিটি শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' উপন্যাসের। কেষ্টর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মেজদিদি তাকে নিজের কাছে আনার জন্য অভিমান করে প্রবল জ্বরের ঘোরে মাটিতে পড়ে রয়েছিলেন তখন বিপিন একথা বলেছিলেন।

Q. ৩০। 'স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না।' – এখানে 'স্বামী-স্ত্রী' কারা?

Ans:- এখানে স্বামী-স্ত্রী – বিপিন ও হেমাঙ্গিনী।

Q. ৩১। 'অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেমন ব্যবহার করে, ইহারাও ঠিক সেই রূপ আচরণ করিয়া বসিল।' – 'ইহারা' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

Ans:- ইহারা বলতে কেষ্ট ও উমার কথা বলা হয়েছে।

Q. ৫২। "আমি কি কোন সর্বনাশীর নাম মুখ এনেচি" – বক্তা কে?
Ans:- কাদম্বিনী।
Q. ৫৩। "এত বড় আশ্চর্য কথা, শুনলে বিশ্বাস হয় না যে, এখন কি করলে রাগ থামবেক' – বক্তা কে?
Ans:- হেমাঙ্গিনী।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ
Q. ১। "বড় কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত রাখতে হবে তো!" – বড় কুটুম কে? উক্তিটি কার?
Ans:- বড় কুটুম হলেন কেষ্ট। উক্তিটি কাদম্বিনীর।
Q. ২। হেমাঙ্গিনীর ছেলে ও মেয়ের নাম কী?
Ans:- হেমাঙ্গিনীর ছেলের নাম ললিত ও মেয়ের নাম উমা।
Q. ৩। 'মেজদিদি' পাঠটির লেখক কে? মেজদিদির স্বামীর নাম কী?
Ans:- মেজদিদি পাঠটির লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মেজদিদির স্বামীর নাম বিপিন।
Q. ৪। "এ বেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল আমার ওখানে খাবে দিদি।" – কে এবং কাকে এ কথা বলেছে?
Ans:- হেমাঙ্গিনী কাদম্বিনীকে একথা বলেছে।
Q. ৫। "বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, 'তুমি যা চাও তাই হবে, তুমি ভালো হয়ে ওঠো।" – এই উক্তি কোন্ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে? 'তুমি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

Ans:- এই উক্তি শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' উপন্যাস থেকে গৃহীত। 'তুমি' বলতে 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিনীকে বলা হয়েছে।
Q. ৬। "প্রত্যুত্তরে কেষ্ট কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল, ডাক্তার বলে যে বুকে সর্দি বসেছে।" – 'প্রত্যুত্তর' শব্দটির অর্থ কী? কার বুকে সর্দি বসেছিল?
Ans:- 'প্রত্যুত্তর' শব্দের অর্থ হল কোনো কথার পাল্টা জবাব দেওয়া। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর বুকে সর্দি বসেছিল।
Q. ৭। "উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেমনি ধারা করিতে লাগিল।"- কারণ কী? 'প্রহরণ' শব্দের অর্থ কী?
Ans:- কেষ্ট কাদম্বিনীর বাড়িতে আসার পর থেকেই কাদম্বিনীর আচরণে তার মনে করা এক ভয় তাড়া করতে থাকে। হেমাঙ্গিনীর বাড়ি থেকে কেষ্ট এবং 'পাঁচুগোপাল খেয়ে গেলে রুইমাছের মাথা কার পাতে পড়েছিল একথা কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করলে, কেষ্ট বুঝতে পারল যে কাদম্বিনী একথা জানতে পারলে তাকে অপমান সহ্য করতে হবে। তাই সে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দেয়। কোনো প্রাণীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বলি দেবার যখন উদ্যোগ করা হয় তখন সেই প্রাণীর মধ্যে যেমন প্রচণ্ড ভয়ের সৃষ্টি হয়, কেষ্টর অবস্থাও সেরকম হয়েছিল।
'প্রহরণ' শব্দের অর্থ প্রহার করা।
Q. ৮। "তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়ে মানুষ আর সংসারে নেই।" – কে, কার সম্বন্ধে একথা বলেছে?
Ans:- কাদম্বিনীকে উদ্দেশ্য করে হেমাঙ্গিনী এ কথা বলেছে।
Q. ৯। "কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি; পুজো দিলে অসুখ সেরে যায়।" – 'তৎক্ষণাৎ' শব্দটির অর্থ কী? বিশালাক্ষী ঠাকুর কার গাঁয়ে আছেন?
Ans:- 'তৎক্ষণাৎ' শব্দটির অর্থ অবিলম্বে। বিশালাক্ষী ঠাকুরের মন্দির কেষ্টর গাঁয়ে আছে।
Q. ১০। "এবার ভাশুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুট খুলিয়া একটা কলাপাতার ঠোঙ্গা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 'হিংসুক আমরা! – ভাশুরের নাম কী? কেষ্ট তাঁর কে হয়?
Ans:- ভাশুরের নাম নবীন মুখুজ্যে। কেষ্ট তার বৈমাত্রেয় শ্যালক।
Q. ১১। "বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ির দামটা ফেলে দিক, আমরা আর কোথায় উঠে যাই।" – উক্তিটি কার? 'বিপিন' কে?
Ans:- উক্তিটি নবীন মুখুজ্যের। বিপিন হল নবীনের ভাই ও হেমাঙ্গিনীর স্বামী।
Q. ১২। "সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলিরে কেষ্ট ?" – কেষ্ট দোকান থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল এবং কেন?
Ans:- কেষ্ট দোকান থেকে পালিয়ে সমস্ত দুপুরে দুটি পেয়ারা সংগ্রহ করতে গেল। হেমাঙ্গিনীর জ্বর হয়েছে। আর জ্বরের মুখে পেয়ারা খেতে ভালো লাগবে। এজন্য তা সংগ্রহ করে হেমাঙ্গিনীকে দেওয়ার জন্য।
Q. ১৩। "ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্যন্ত একদিন পেটভরে খেতে দাও না।" – উক্তিটি কার? 'হতভাগা' কে? তাকে বাড়িতে কী কী কাজ করতে হত?
Ans:- উক্তিটি মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর। 'হতভাগা' হল কেষ্ট।
তাকে দিয়ে কাদম্বিনী বাসন মাজাত, কাপড় কাচাতো আর নবীনের আড়তে ধান চাল মাপত এবং রৌদ্রে ঘুরে ধানের নমুনা সংগ্রহগ করত।
Q. ১৪। "বেশ নধর গোলগাল দেহটি ত" – কে, কার সম্বন্ধে এ কথা বলেছে?

Q. ১০। হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের এক পার্শ্বে সরিয়া দাড়াইতেই বড় কর্তা তীব্র কটু কণ্ঠে শুরু করিয়া দিলেন, 'তোমার জন্যে আর তো আমরা বাড়িতে টিকতে পারিনে মেজবৌমা।" – বড় কর্তার নাম কী? তিনি সম্পর্কে মেজবৌমার কে হন? তিনি মেজ বৌমাকে কেন এমন কথা বলেছেন আলোচনা করো।

Ans:- বড় কর্তার নাম নবীন মুখুজ্যে।

তিনি সম্পর্কে মেজবৌমার ভাশুর। কেষ্ট গয়লাদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা দিয়ে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর আরোগ্য লাভের জন্য বিশালাক্ষ্মী দেবীর কাছে পূজা দিতে যায়। তাই নবীন ও কাদম্বিনী দোষারোপ করে হেমাঙ্গিনীর শিক্ষার জন্যই কেষ্ট চুরি করতে শিখেছে। ভাশুর কটু কণ্ঠে হেমাঙ্গিনীকে বলতে লাগলেন তার জন্য কি তারা এ বাড়িতে টিকতে পারবেন না।

Q. ১১। কেষ্ট কার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গিয়েছিল? ওই টাকা দিয়ে সে কী করেছিল? এর ফলে কী হয়েছিল?

Ans:- কেষ্ট গয়লাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গিয়েছিল। কেষ্ট ওই টাকা দিয়ে অসুস্থ মেজদিদির আরোগ্য কামনায় তাদের গ্রামের জাগ্রত দেবী বিশালাক্ষ্মীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। পূজা দিয়ে কলাপাতার ঠোঙায় প্রসাদ নিয়ে ফিরে এলে টাকা চুরির অপরাধে নবীন কেষ্টকে চোরের মার দিলেন। এত বেশি মার খেয়েও কেষ্ট একটুও কাঁদেনি। ক্ষোভে দুঃখে ও বেদনায় তার হৃদয় পাথর হয়ে গিয়েছিল। সে চণ্ডীমণ্ডপে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

Q. ১২। "ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরু স্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া আদর করিয়া 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন।" – ছেলেটি কে? সম্পর্কে হেমাঙ্গিনীর সে কী হয়? হেমাঙ্গিনী কৌশল করে তার কাছে। থেকে কী জেনে নিলেন?

Ans:- ছেলেটি হল কেষ্ট।

সম্পর্কে হেমাঙ্গিনীর বড় জা কাদম্বিনীর সে বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ সম্পর্কে সে হেমাঙ্গিনীরও ভাই। হেমাঙ্গিনী কৌশল করে তার দেশের অর্থাৎ গ্রামের বাড়ির কথা, মায়ের কথা, মা কিভাবে আদর যত্ন করতেন, খাওয়াতেন, মায়ের মৃত্যুর কথা ইত্যাদি জেনে নেন। এরপর এখানে দিদির বাড়িতে তাকে কী কী কাজ করতে হয়। খাওয়া দাওয়ার কথা, দোকানে ধান-চাল ওজন দেওয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধানের নমুনা সংগ্রহ করা ইত্যাদি এমন অনেক কথা জেনে নেন।

Q. ১৩। "কাদম্বিনী অবাক হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা।" – কাদম্বিনী কে? কার কথা শুনে তিনি এত অবাক হয়েছিলেন? পাঁচুগোপালের সঙ্গে কাদম্বিনীর কী সম্পর্ক? পাঁচুগোপালের সঙ্গে কার তুলনা করেছিলেন?

Ans:- কাদম্বিনী মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর বড় জা, কেষ্টর সৎদিদি।

মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর কথা শুনে তিনি এত অবাক হয়েছিলেন।

কাদম্বিনী ও পাঁচুগোপাল মা ও ছেলে। পাঁচুগোপালের সঙ্গে কেষ্ট-এর তুলনা করা হয়েছিল।

Q. ১৪। "ও বাড়ীতে গিয়ে খে গে যা। বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।" – কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে? 'ও-বাড়ী' বলতে কোন্ বাড়ীর কথা বলা হয়েছে? হেমাঙ্গিনীর এহেন উক্তির কারণ কী আলোচনা করো।

Ans:- কেষ্টকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে। 'ও বাড়ী' বলতে কাদম্বিনীর বাড়ীর কথা বলা হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলে তার বড় জা কাদম্বিনী তাকে সবসময় কটুকথা শোনাতেন। সেদিনও কাদম্বিনী এসে কেষ্টকে নিয়ে হেমাঙ্গিনীকে যা খুশি তা বলে গেলেন। ঠিক সেই সময়ে কেষ্টও সেখানে এসে হাজির হয়। কেষ্টর প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে বললে হেমাঙ্গিনী তার বড় জা কাদম্বিনীর কথায় ত্যক্ত হয়ে কেষ্টকে এমন কথা বলেছিলেন।

Q. ১৫। "কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্র বিঁধতে থাকেন।" ছোঁড়াটি কে? 'আমাকে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, এবং তাকে দিবারাত্র কেন কথা শুনতে হয় আলোচনা করো।

Ans:- ছোঁড়াটি হল কেষ্ট। 'আমাকে' বলতে হেমাঙ্গিনীকে বোঝানো হয়েছে।

মেজদিদি হেমাঙ্গিনী ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের নারী। তিনি কেষ্টকে সন্তানের ন্যায় দেখতেন এবং স্নেহ করতেন। কেষ্টকে সবসময়ই কাদম্বিনীর হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন। তিনি তাকে সবসময়ই লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার দিতেন। কেষ্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর এরূপ ভালোবাসা দেখে কাদম্বিনী সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কেষ্টকে গালাগালি ও নিপীড়ন করতেন, যা হেমাঙ্গিনীকে ভীষণ ভাবে আঘাত করত।

Q. ১৬। "সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলিরে কেষ্ট?" – কেষ্টকে এই প্রশ্নটি কে করে? কেষ্ট দোকান থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল?

Ans:- কাদম্বিনী কেষ্টকে এ প্রশ্ন করেছিলেন।

কেষ্ট দোকান থেকে পালিয়ে অসুস্থ মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর জন্য অসময়ের দুটি পেয়ারা আনতে গিয়েছিল। কেষ্ট সারা দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে দুটি পেয়ারা জোগাড় করে আনে যাতে জ্বরের মুখে মেজদিদির খেতে ভাল লাগে।

Q. ১৮। 'মুহূর্তকালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মতো স্তম্ভিত হইয়া রহিল।' – 'মেজদিদি' উপন্যাস অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণ দাও।

হেমাঙ্গিনী জ্বরে অসুস্থ হলে কেষ্ট নবীনকে না বলে হেমাঙ্গিনীর জন্য অসময়ের পেয়ারা জোগাড় করতে দোকান ছেড়ে চলে আসে। কেষ্টর এই দোকান পালানোর অপরাধের জন্য কাদম্বিনী তার রাতের আহার বন্ধ করে দেন। হেমাঙ্গিনী পরের দিন একথা জানতে পেরে কেষ্টকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। কাদম্বিনী তা জানতে পেরে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেন। তখন হেমাঙ্গিনী বলেন কাদম্বিনী যেন তার ছেলেকে অনাহারে রেখে পরের ছেলেকে শাসন করেন। একথার উত্তরে কাদম্বিনী বলেন যে দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা হয় না। তখন হেমাঙ্গিনী এই উক্তিটি কাদম্বিনীর প্রতি করেছিলেন।

Q. ৪। "সে কি করে বুঝাইবে, তার পীড়িত আর্ত হৃদয় দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার মাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে।" কাকে লক্ষ্য করে কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তিটি করা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখো।

Ans:- কেষ্টকে লক্ষ্য করে এই উক্তিটি করা হয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর পর কেষ্ট রাজহাটে এসে সৎদিদি কাদম্বিনীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কাদম্বিনী তাকে গলগ্রহ মনে করতেন। কেষ্টকে দিয়ে কাদম্বিনী বাড়ির কাজ করাতেন। কেষ্ট ছিল তার বিধবা মায়ের আদরের ছেলে। কেষ্টর মা গরীব হলেও কেষ্টকে ভালো রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। মায়ের মৃত্যুর পর কেষ্ট অনাথ হয়ে পড়ে। সে মায়ের অনুপস্থিতিতে দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে তাঁর মাকে খুঁজে বেড়াত।

Q. ৫। "এ হাতির খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে।" – বক্তা কে? বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তার মানসিকতা বুঝিয়ে দাও।

Ans:- এখানে বক্তা হলেন কাদম্বিনী।

বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর কেষ্ট সৎদিদি কাদম্বিনীর রাজহাটের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কাদম্বিনী কেষ্টকে আপদ বলে মনে করতেন। তিনি সবসময়ই কেষ্টকে গালিগালাজ আর কর্কশ বাক্যে শাসন করতেন। একদিন কেষ্ট ভাত খেতে বসলে কেষ্ট ও নবীন পাশাপাশি বসেছিলেন। নবীন কেষ্টর থালা খালি দেখে কাদম্বিনীকে আরও চারটা ভাত তাকে দিতে বললে। তখন কাদম্বিনী আর এক থালা ভাত এনে কেষ্টর থালায় ঢেলে দিয়ে বললেন এভাবে হাতির খোরাক প্রতিদিন দিলে তাদের ভাঁড়ার শূন্য হতে সময় লাগবে না।

Q. ৬। "কেঁচো সাপের মতন চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।" কার কথা বলা হয়েছে? কার মনে বিস্ময় জেগেছিল? বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

অথবা,

এখানে কাকে কেঁচো বলা হয়েছে? কার বিস্ময় জেগেছিল? প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

Ans:- কেষ্ট সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর মনে বিস্ময় জেগেছিল।

কোন একদিন কেষ্ট ভাত খেতে বসে ভাতের থালা ফেলে উঠে গেলে কাদম্বিনী বললেন কার জোরে কেষ্ট এমন কাজ করার সাহস পায়। কাদম্বিনী বললেন, হেমাঙ্গিনী যেন কেষ্টকে আর না ডাকেন। হেমাঙ্গিনী এসব কথা শোনে কাদম্বিনীকে কিছু বললেন না। কিন্তু তার মনে বিস্ময় জাগল। হেমাঙ্গিনী ভাবতে লাগলেন কত বেশি আঘাত পেলে কারো পক্ষে এমন করা সম্ভব।

Q. ৭। "অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে; এরাও ঠিক সেইরূপ আচরণ করে বসিল।" – গৃহস্বামীটি কে? কাদের চোরের দলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দাও।

Ans:- গৃহস্বামীটি হলেন বিপিন। কেষ্ট ও উমাকে চোরের দলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উমা এসে যখন তার মা হেমাঙ্গিনীকে জানায় বিপিন আসছেন তখন মেজদিদি হেমাঙ্গিনী বললেন যে বাবু আসছেন। ভাত খেতে বসে কেষ্ট অর্ধেক খাওয়া ভাত ফেলে রান্নাঘরে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। কেষ্টকে দেখে উমাও অন্যদিকে পলায়ন করে। কারণ তার মার অপমান সে সহ্য করতে পারে না। গৃহস্বামীর আগমন দেখে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে, কেষ্ট এবং উমা ঠিক তেমনি ব্যবহার করল।

Q. ৮। "কেন তুই পুতুলনাচ দেখতে গেলি না কেষ্ট? গেলে ত এইসব হত না।" কেষ্ট পুতুলনাচ দেখতে না গিয়ে কোথায় গিয়েছিল? এইসব বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

Ans:- কেষ্ট পুতুলনাচ দেখতে না গিয়ে অসুস্থ মেজদিদির ঘরে গিয়েছিল তাকে দেখতে।

কেষ্ট পাড়ার দত্তদের বাড়ি পুতুলনাচ দেখতে যাবে বলে কাদম্বিনীর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে হেমাঙ্গিনীকে দেখতে যায়। কাদম্বিনী হেমাঙ্গিনীর পাশে বসা কেষ্টকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। সে তাকে বজ্জাত, মিথ্যুক বলে গালিগালাজ করে। এতে হেমাঙ্গিনী মনে খুব লাগে। তখন হেমাঙ্গিনী বলেন কেষ্ট যদি তার এখানে না এসে পুতুল নাচ দেখতে যেত তাহলে এমন কথা শোনতে হত না।

Q. ৯। "তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকে মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে।" – তিনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 'নিরুপায়' শব্দটির অর্থ কী? ছেলেটি অনাথ কেন?

Ans:- তিনি বলতে হেমাঙ্গিনীকে বোঝানো হয়েছে। 'নিরুপায়' শব্দের অর্থ যার কোনো উপায় নেই।

ছেলেটি বলতে কেষ্টর কথা বলা হয়েছে। কেষ্ট অনাথ কারণ তার মা-বাবা দুজনেই মারা গিয়েছিলেন।

কষ্টের মুহূর্তে আপনজনদের কথা মনে পড়ে। তাই সে সময় দেখা যায় কেষ্ট তার মা এবং হেমাঙ্গিনীর মতো অতিশয় হৃদয়বতী নারীর কথা মনে করে কাঁদতে থাকে।

Q. ২৫। "এ দেশে এমন করে যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তার মাথায় ঢুকিল না।" – এখানে কার কথা বলা হয়েছে? উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

Ans:- এখানে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর সুমধুর কথা বলার কথা বলা হয়েছে।

কাদম্বিনী কেষ্টকে বাড়তি বোঝা বলে মনে করতেন। তিনি সবসময়ই কেষ্টর উপর শাসন, নিপীড়ন ও গালিগালাজ চালাতেন। সেই একই বাড়িতে কাদম্বিনীর জা হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে কেষ্ট মাতৃ-সুলভ স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল। কেষ্ট কখনও কাদম্বিনীর কাছ থেকে মিষ্ট কথা শোনেনি। সে জায়গায় হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে এমন সুমধুর ব্যবহার সে কখনও পেতে পারে তা কোনো দিন ভাবতেও পারেনি।

Q. ২৬। ''যিনি রাত-দিন কচ্ছেন, তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।" – এটা কার উক্তি? কোন্ প্রসঙ্গে এটা করা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখো।

Ans:- এটা কাদম্বিনীর উক্তি।

হেমাঙ্গিনী যখন জানতে পারলেন গতকাল কেষ্ট না খেয়ে সারাদিন ছিল তখন হেমাঙ্গিনী তাকে কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। তিনি কেষ্টকে বললেন সে যেন তাঁকে তার মরা মা মনে করে। কাদম্বিনী এ সব কথা জানতে পেরে নিজের বাড়ি থেকে হেমাঙ্গিনীকে ডেকে বললেন, "ভাইকে আমি কি খাওয়াতে পারিনে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে বলতে গেছ?" এ ধরনের গা-জ্বালা কথা শুনে হেমাঙ্গিনী সহ্য করতে না পেরে কাদম্বিনীকে বললেন পেটে মেরে আগে নিজের ছেলেকে শাসন করো, তারপর পরের ছেলেকে করো। একথা শুনে কাদম্বিনী মেজ-জাকে অনেক কথা শোনালেন। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে দাসীকে উপলক্ষ্য করে তিনি উপরোক্ত উক্তিটি করেন।

Q. ২৭। "নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করে ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁর কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে – চাপিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।" – এখানে কার কথা বলা হয়েছে এবং কার ছেলের কথা বলা হয়েছে? কে কান্না চাপতে-চাপতে বাড়ি চলে গেলেন? প্রসঙ্গটি বিশদ করো।

Ans:- এখানে হেমাঙ্গিনীর কথা বলা হয়েছে এবং হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতের কথা বলা হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী কান্না চাপতে-চাপতে বাড়ি চলে গেলেন।

কেষ্ট বেলা তিনটা নাগাদ দোকান থেকে বাড়ি এসে দেখল দিদি কাদম্বিনী খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তাকে যে কেষ্ট ডাকবে সে সাহস কেষ্টর ছিল না। কাদম্বিনীর মেয়ে টুনি বলল যে রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে, সে যেন খেয়ে নেয়। হেমাঙ্গিনী কেষ্টর থালায় শুকনো ভাত ও সামান্য ডাল দেখে ব্যথিত হলেন। তিনি বাড়ি গিয়ে এক বাটি দুধ এনে দিলেন। দুধ পেয়ে কেষ্টর মন ভরে গেল। হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিত কেষ্টর সমবয়সী কেষ্টর এ অবস্থায় নিজের ছেলেকে দাঁড় করিয়ে হেমাঙ্গিনীর দু-চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি কান্না চাপতে-চাপতে বাড়ি চলে গেলেন।

Q. ২৮। "অনতি পূর্বেই মায়াকান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল সেই ধমক তার এত বড় মাতৃশোকেও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।" – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

অথবা,

কে, কার বকুনি খেয়েছিল এবং কেন? প্রসঙ্গটি বিশদ করো।

Ans:- কেষ্ট কাদম্বিনীর কাছে বকুনি খেয়েছিল।

কেষ্ট দীর্ঘপথ হেঁটে দিদি কাদম্বিনীর বাড়িতে এসেছে। তার উপর পূর্বদিনও খায়নি তাই তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাই খেতে বসে পাতের ভাত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলায় নবীন কেষ্টকে আরও ভাত দিতে বললে কাদম্বিনী বলেন, এ হাতির খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে তাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে। একথা শুনে মর্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি ঝুঁকে পড়ে। তার দু চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে ভাতের থালায় টপটপ করে পড়তে লাগল। কিন্তু দিদির ভয়ে চোখ মুছতে পারল না। কিছু সময় পূর্বেই মায়ের কথা স্মরণ করে কাঁদবার জন্য তাকে 'মায়াকান্না' বলে বকুনি খেতে হয়েছিল। দিদির ধমক তার মাতৃশোককে চেপে রাখল।

Q. ২৯। "আমি মা – আমার কোলে ছেলে পুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন। এর বেশি আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাই নে।" – এটা কার উক্তি? কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে সংক্ষেপে লেখো।

Ans:- উক্তিটি মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর।

হেমাঙ্গিনী সবসময়ই কেষ্টর প্রতি কাদম্বিনীর করা অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন। কেষ্ট একদিন কাদম্বিনীকে বলে দিয়েছিল মেজদিদি হেমাঙ্গিনী থাকতে সে কাউকে ভয় করে না। এ ব্যাপার নিয়ে হেমাঙ্গিনীকে কাদম্বিনী গালিগালাজ করেন। তাতে হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিন বিরক্ত হয়ে স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে এবিষয় নিয়ে অভিযোগ করলে হেমাঙ্গিনী বলেন, সে মা। তিনি কেষ্টকে সন্তানের মতো দেখেন। তার নিজের সন্তান আছে। তিনি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চান না। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ভগবানই করবেন।

Ans:- হেমাঙ্গিনী জ্বরে অসুস্থ হলে কেষ্ট তাঁর আরোগ্য কামনায় তাগদার আদায়ী টাকা নিয়ে কেষ্ট তার গ্রামের জাগ্রত দেবতা বিশালাক্ষীর পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আসার পর কাদম্বিনী তাকে ধরে ফেললেন এবং স্বামী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অসুস্থ হেমাঙ্গিনীর বাড়ি গিয়ে জঘন্য অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে আক্রমণ করলেন। কাদম্বিনী বললেন হেমাঙ্গিনীর সান্নিধ্য পেয়েই কেষ্ট চুরি করা শিখেছে। আর দুদিন পর ডাকাত হবে। তার এরূপ স্বভাব আগে ছিল না। আর তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে এত কথা বার্তা কিসের? কাদম্বিনীর এধরনের মিথ্যা অপবাদ শুনে হেমাঙ্গিনী ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

Q. ১৯। 'পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তারপরে পরের ছেলেকে করো।' – বক্তা কে? কাকে তিনি একথা বলেছেন? 'নিজের ছেলে' আর 'পরের ছেলে' কারা লেখো।

Ans:- বক্তা মেজদিদি হেমাঙ্গিনী। বড়-জা কাদম্বিনীকে তিনি একথা বলেছেন। কাদম্বিনীর নিজের ছেলে পাঁচুগোপাল, আর পরের ছেলে বলতে কেষ্টকে বোঝানো হয়েছে।

Q. ২০। "আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েছে। আমি কেষ্টর মা।" হেমাঙ্গিনী কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে?

Ans:- হেমাঙ্গিনী জ্বর গায়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইলে বিপিন ব্যস্ত হয়ে তাকে বিছানায় তুলতে গেলে হেমাঙ্গিনী বিপিনের কাছ থেকে কেষ্টকে আশ্রয় দেওয়ার কথা আদায় করে নেন। কিন্তু স্ত্রীকে সুস্থ দেখে বিপিন যখন পরদিন সকালবেলা সে কথাকে তুচ্ছ করেছিলেন তখন হেমাঙ্গিনী শান্ত দৃঢ় কন্ঠে বললেন আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। আজ থেকে তার তিনটি সন্তান হয়েছে তিনি কেষ্টরেও মা।

Q. ২১। "শপথ কচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।" – কে বলেছেন? ভাই-বোন কারা? উক্তিটি প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

Ans:- হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিন এ উক্তিটি করেছেন। ভাই-বোন হল হেমাঙ্গিনী ও কেষ্ট।

কেষ্ট নবীনের দোকান থেকে টাকা চুরি করে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর আরোগ্য কামনায় বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে পূজা দিতে যায়। চুরি করার অপরাধে নবীন তাকে মারধর করেন। এতবেশি মার খেয়েও সে কাঁদেনি। সে চণ্ডীমণ্ডপে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়লে হেমাঙ্গিনী এ দুঃসহ সংবাদ শুনতে পেরে স্থির থাকতে পারেননি। তখন হেমাঙ্গিনী স্বামীর কাছে কেষ্টর আশ্রয় ভিক্ষে চাইলেন। কিন্তু তাতে বিপিন বিফল হলে হেমাঙ্গিনী অভিমানে কেষ্টকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। তিনি গরু গাড়ি ধরে যাত্রা করেন। বিপিন পরে হেমাঙ্গিনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে শপথ করেন যে তিনি বেঁচে থাকতে তাদের দুই ভাই –বোনকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। বিপিন তার বাড়িতে কেষ্টকে আশ্রয় দেয়।

Q. ২২। "এই সেই দিনও ঘুড়ি লাটাই কিনিবার জন্য দু-মুঠা ভাত বেশি খাইয়া পয়সা আদায় করে লইয়াছিল।' – কার সম্বন্ধে এই উক্তিটি করা হয়েছে? প্রসঙ্গটি বিশদ করো।

Ans:- কেষ্ট সম্বন্ধে এই উক্তিটি করা হয়েছে।

কেষ্টর মা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তিনি কেষ্টকে তা সত্ত্বেও কখনো দুঃখ-কষ্ট দেন নি। কেষ্ট ভাত খেতে না চাইলে তার মা তাকে ঘুড়ি-লাটাই কিনে দেবার পয়সা দিয়ে দুমুঠো ভাত বেশি খাওয়াতেন। মায়ের মৃত্যুর পর কাদম্বিনীর ঘরে যখন কেষ্টকে বেশি খাওয়ার খোঁটা শুনতে হয় তখন এ সব কথা তার মনে পড়ে যায়।

Q. ২৩। "তার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।" – এখানে কার ক্ষুধার কথা বলা হয়েছে? দিদি কাকে বলা হয়েছে? দিদিকে ডেকে তুলবার সাহস কার হল না এবং কেন? প্রসঙ্গটি বিশদ করো।

Ans:- এখানে কেষ্টর ক্ষুধার কথা বলা হয়েছে। 'দিদি' কাদম্বিনীকে বলা হয়েছে।

কেষ্ট কাদম্বিনীর স্বামী নবীনের ধান চালের আড়তে কাজ করত। একদিন দুপুরে ভাত খেতে এসে দেরি করে নবীন দোকানে যান। নবীন দোকানে যাওয়ার পর কেষ্ট যখন দুপুর তিনটায় বাড়িতে ভাত খেতে আসে তখন দেখে কাদম্বিনী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ভাত চাওয়ার মতো সাহস কেষ্টর ছিল না। ক্ষুধায় কেষ্টর মনে হচ্ছিল বাঘের মুখ হতেও খাবার কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু দিদিকে ডেকে তোলার মতো সাহস কেষ্টর ছিল না।

Q. ২৪। "মাতাপুত্র এই নিরাপদ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করে, লাঞ্ছনা করে, অপমান করে, দত্তক দিয়া চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূমিশয্যায় পড়িয়া আজ অনেকদিন পর আবার মাকে স্মরণ করে মেজদির নাম করে ফুলিয়া কাঁদিতে লাগল।" – মাতাপুত্র কারা? প্রসঙ্গটি আলোচনা করো।

Ans:- মাতা-পুত্র হল কাদম্বিনী ও পাঁচুগোপাল।

উপরোক্ত উক্তিটি কেষ্টর উপর কাদম্বিনীর শাসন প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

হেমাঙ্গিনীর জ্বর হলে কেষ্ট দোকান থেকে পালিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর জন্য দুটি অসময়ের পেয়ারা এনে দেয়। কাদম্বিনী কেষ্টকে দোকান থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল তা জানতে চাইলে কেষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় কাদম্বিনী তার পুত্র পাঁচুগোপালকে দিয়ে কেষ্টর কান মলে দিলেন এবং রাতের খাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। সে অপমানে ও ক্ষোভে কাঁদতে শুরু করে।

দিবা দ্বিপ্রহরে

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্ন ১। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটির লেখক কে?

Ans:- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ২। 'বনফুল' কোন্ লেখকের ছদ্মনাম?

Ans:- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ৩। বনফুল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

Ans:- ১৮৯৯ সালে।

প্রশ্ন ৪। 'দিবা দ্বিপ্রহর' গল্পের সাপটি কোথায় আত্মগোপন করেছিল?

Ans:- সাপটি ইঁটের গাদায় আত্মগোপন করেছিল।

প্রশ্ন ৫। "অন্ধকার ঘনীভূত হইতে জনতা ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল' গল্পাংশটির লেখক কে?

Ans:- বলাইচাদঁ মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ৬। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় পেশায় কী ছিলেন?

Ans:- চিকিৎসক।

প্রশ্ন ৭। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পে কয়টি পরিচ্ছেদ আছে?

Ans:- চারটি।

প্রশ্ন ৮। হারুঘোষের মেজ ছেলের নাম কী?

Ans:- ন্যাপলা।

প্রশ্ন ১১। হারুঘোষের ছেলেকে কখন সাপে কেটেছিল?

Ans:- সকালবেলায়।

প্রশ্ন ৯। ন্যাপলা কে?

Ans:- হারুঘোষের মেজছেলে।

প্রশ্ন ১০। "লোকটির চেহারা অদ্ভুত।" – কোন্ লোকটির চেহারা অদ্ভুত?

Ans:- আগন্তুকের।

প্রশ্ন ১২। ন্যাপলাকে কামড় দেওয়া সাপটি কী বিষাক্ত ছিল?

Ans:- হ্যাঁ, সাপটি বিষাক্ত ছিল।

প্রশ্ন ১৩। "ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না, কিৎসু হবে না।"- এটি কার উক্তি?Ans:- আগন্তুকের।

প্রশ্ন ১৪। "রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও, চুমু দাও একটা আমাকে।"- এটি কার উক্তি?

Ans:- এটি আগন্তুকের উক্তি।

প্রশ্ন ১৫। "দেখিতে দেখিতে জনতা সাপ ছাড়িয়া আগন্তুককে লইয়া পড়িল।" – 'আগন্তুক' শব্দের অর্থ কী?

Ans:- নবাগত লোক।

প্রশ্ন ১৬। "এ একটা পাগল।" – পাগলটি কে?

Ans:- আগন্তুক।

প্রশ্ন ১৭। কে সাপটিকে বল্লমবিদ্ধ করে ইঁটের গাদা থেকে বের করে এনেছিল?

Ans:- বিশু বাগদী।

প্রশ্ন ১৮। আগন্তুককে জনতা কী ভেবেছিল?

Ans:- মস্ত গুণী ওঝা ভেবেছিল।

প্রশ্ন ১৯। সাপটি আগন্তুককে কয়বার দংশন করেছিল?

Ans:- তিনবার।

প্রশ্ন ২০। আগন্তুক কোথা হতে পালিয়ে এসেছিল?

Ans:- পাগলাগারদ থেকে।

প্রশ্ন ২১। 'দিবা দ্বিপ্রহর' গল্পে গোখরো সাপ কাকে কামড়েছিল?

Ans:- গোখরো সাপ হারু ঘোষের ছেলে ন্যাপলাকে কামড়ে ছিল।

প্রশ্ন ২২। 'এ একটা পাগল' – উক্তিটি কার?

Ans:- দারোগাবাবুর।

প্রশ্ন ২৩। 'অন্ধকার ঘনীভূত হইতে জনতা ক্রমশ ______ হইয়া পড়িল।' (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

Ans:- ছত্রভঙ্গ।

প্রশ্ন ২৪। 'হুলিয়া' কী?

Ans:- হুলিয়া হচ্ছে পলাতক আসামিকে ধরতে তার চেহারার বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্ন ১।"আলবৎ উপায় আছে, মন্তর ঝাড়ব আর উঠে বসবে।" – বক্তা কে? কে উঠে বসবে?

Ans:- বক্তা হলেন আগন্তুক। ন্যাপলা উঠে বসবে।

প্রশ্ন ২। "একে ধরবার জন্য চারিদিকে ফোটো পাঠিয়ে হুলিয়া বার করা হয়েছে।" – বক্তা কে? 'হুলিয়া' শব্দের অর্থ কী?

Ans:- বক্তা হলেন হারু ঘোষ। 'হুলিয়া' শব্দের অর্থ মুখমণ্ডলের গঠন ও আকৃতি।

প্রশ্ন ৩। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটিতে গোখরো সাপ কাকে কামড়ে ছিল? সে কার ছেলে ছিল?

Ans:- গোখরো সাপ ন্যাপলাকে কামড়েছিল। সে হারু ঘোষের ছেলে।

প্রশ্ন ৪। "একেই তো আমরা খুঁজছি।" – বক্তা কে? কাকে খুঁজছিলেন?

Ans:- বক্তা হলেন দারোগা সাহেব। আগন্তুককে খুঁজছিলেন।

প্রশ্ন ৫। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটি কে লিখেছেন? বাংলা সাহিত্যে তাঁর আরেকটি নাম আছে – সেটি কী?

Ans:- 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আরেকটি নাম আছে – সেটি হল বনফুল।

প্রশ্ন ৬। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটিতে গোখরো সাপ কাকে কাকে কামড়েছিল?

Ans:- ন্যাপলা ও আগন্তুককে।

Q. ৩০। "আর দুটি ভাত দাও গো।" – কে, কাকে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছে?
Ans:- চোদ্দো বছর বয়সে মাকে হারিয়ে অনাথ কেষ্ট বৈমাত্রের বড়ো বোন কাদম্বিনীর সংসারে এসে উঠে। লোকলজ্জার ভয়ে অনিচ্ছার মধ্যেও দিদি তাকে তার সংসারে ঠাঁই দেয়। সৎদিদির সংসারে তার আপ্যায়নটি ছিল অত্যন্ত কদর্য তবু নিরুপায় বলে নারিকেলের খোলায় করে এনে দেওয়া সামান্য তেল মেখে চান করে সে জামাইবাবুর সঙ্গে ভাত খেতে বসে। কেষ্ট গ্রামের ছেলে বিশেষত মায়ের এক ছেলে তাই ভাতটা একটু বেশি খায়। তার ওপর আগের দিন বিকেল থেকে না খেয়ে পরদিন পথটা অনেক হেঁটে এসেছে। বেলাও হয়েছে। এই নানা কারণে সে তার পাতের ভাতগুলো খেয়ে শেষ করেও তার ক্ষুধা মিটে না। তার জামাইবাবু নবীন মুখজ্জে সামনেই যাচ্ছিল, তা দেখে কাদম্বিনীকে বলে কেষ্টকে আর একটু ভাত দিতে।
Q. ৩১। "এই পনেরো-ষোলো বছরের ঘরকন্নায় স্বামীর এত বড় ভ্রাতৃভক্তি তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই।" – কার এবং কোন ভ্রাতৃভক্তির কথা এখানে বলা হয়েছে?
Ans:- এখানে মেজদিদির স্বামী বিপিনের ভ্রাতৃপ্রীতির কথা বলা হয়েছে। বিপিন বড় শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি নিজের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে শান্তিতে থাকতে পছন্দ করেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বড় ভাই নবীন ও বিপিনের পরিবার একান্নবর্তী পরিবার ছিল। পরে দুই জা-এর মধ্যে কলহের ফলে আলাদা হয়েছেন। বিপিন স্ত্রীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। কিন্তু যখন কেষ্টকে নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি বাড়তে থাকে তখন হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে শুরু করলে, বিপিন তা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং দুই পরিবারের ঝগড়া বাঁধলে বিপিন স্ত্রীকে ছেড়ে বড় ভাই নবীনের পক্ষ অবলম্বন করে খলভ্রাতৃভক্তির পরিচয় দেখিয়েছেন। এখানে সেই ভ্রাতৃভক্তির কথাই বলা হয়েছে হেমাঙ্গিনীর মুখ দিয়ে। কারণ হেমাঙ্গিনী স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করছেন প্রায় পনেরো ষোল বছর যাবৎ।
টীকা লেখো:
১। কেষ্ট: 'মেজদিদি' উপন্যাসের একটি গুরত্বপূর্ণ চরিত্র কেষ্ট। তাঁকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির কাহিনি প্রসারিত হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর কেষ্ট সৎদিদি কাদম্বিনীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কাদম্বিনী তাঁকে আপদ বলেই মনে করতেন। কেষ্টকে দিয়ে তিনি চাকরের কাজ করাতেন। কেষ্ট নবীনের আড়তে ধান-চালের মাপা-জোকা করত এবং রৌদ্রে ঘুরে-ঘুরে ধান-চালের নমুনাও জোগাড় করত। সে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর স্নেহ- মায়া-মমতা পেয়ে নতুন জীবন লাভ করেছিল।
৪। নবীন: নবীন কাদম্বিনীর স্বামী ও বিপিনের বড় ভাই। তিনি বিত্তবান লোক। তাঁর ধান-চালের ব্যবসা। চৌদ্দ বছরের বালক কেষ্টকে দিয়ে তিনি এই ব্যবসা চালাতেন। গল্পের শেষাংশে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কেষ্ট টাকা চুরি করার ফলে নবীন মারধর করায় কেষ্টর জ্বর আসে তখন হেমাঙ্গিনী কেষ্টর এ অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারেন না। তিনি বিপিনের কাছে কেষ্টর আশ্রয় ভিক্ষে চেয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বিপিনের বাড়িতে কেষ্ট আশ্রয় পেয়েছিল।
৫। বিপিন: বিপিন হলেন 'মেজদিদি' উপন্যাসে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর স্বামী এবং নবীনের ছোট ভাই। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি শান্তিতে থাকতে পছন্দ করেন। বিপিন কেষ্টকে ভালো পেতেন না। কেষ্টকে নিয়ে যখন উভয় পরিবারে ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু হয় তখন তিনি কেষ্টকে তার বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলেন। গল্পের শেষে দেখা যায় কেষ্টকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিবেন এই প্রতিশ্রুতি স্ত্রীকে দিয়েও সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, এতে কেষ্টকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বাহির হয়ে গেলে তিনি আবার ফিরিয়ে আনেন এবং কেষ্টকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেন।
৬। পাঁচুগোপাল: পাঁচুগোপাল নবীন ও হেমাঙ্গিনীর পুত্র। সে পনেরো-ষোল বছরের বালক। কেষ্টর সমবয়সী ছিল। কিন্তু কেষ্টর সহিত তার সদ্ভাব ছিল না। হেমাঙ্গিনী অসুস্থ হলে তার জন্য কেষ্ট দোকান পালিয়ে অসময়ের দুটি পেয়ারা এনে দিয়েছিল। এই অপরাধের জন্য সে ভাগিনা হয়েও মামা কেষ্টর কান মলে দিয়েছিল।
৭। ললিত: ললিত বিপিন ও হেমাঙ্গিনীর পুত্র। সে কেষ্টকে অন্তর দিয়ে ভীষণ ভালোবাসত। ললিত তা বুঝতে পারে বলেই দত্তদের বাড়ির পুতুলনাচে যাওয়ার আগে সে মার কাছ থেকে টাকা না চেয়ে কেষ্টর সঙ্গে একটু দেখা করে নেওয়ার কথা বলে হেমাঙ্গিনীকে।
৮। উমা: বিপিন ও হেমাঙ্গিনীর মেয়ে উমা। সে কেষ্টকে মামা বলে সম্বোধন করত। সবসময়ই মাকে এসে সে কেষ্টর মামার উপর অত্যাচারের নানা কথা বলত। কাদম্বিনী মেরে কেষ্টর নাক দিয়ে রক্ত বের করে দেওয়ার কথাও উমাই এসে হেমাঙ্গিনীকে জানায়। উমা তার মায়ের খুবই আদরের মেয়ে।
৯। বিশালাক্ষ্মী দেবী: বিশালাক্ষ্মী দেবী কেষ্টর গ্রামের জাগ্রত দেবতা। গ্রামের মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস আপদে-বিপদে তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। হেমাঙ্গিনী অসুস্থ হলে কেষ্ট তাঁর আরোগ্য লাভের আশায় নবীনের দোকান থেকে টাকা চুরি করে এসে বিশালাক্ষ্মী দেবীর এই মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। কেষ্টরও বিশালাক্ষ্মী দেবীর কৃপার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দেবীর পূজা দিলে তার মেজদিদি হেমাঙ্গিনী সুস্থ হয়ে পড়বে।

Ans:- বিশু বাগদী হল পাড়ার সাহসী বালক। হারু ঘোষের মেজছেলেকে সাপ কামড় দিয়ে ইঁটের গাদার মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন গ্রামের সাহসী যুবক বিশু বাগদী সাপের লেজের দিক দেখতে পেয়ে বল্লম বিদ্ধ করে সাপটিকে সেখান থেকে টেনে বের করে আনে। তখন বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর সাপটি ফণা তুলে তর্জন-গর্জন করতে থাকে। সে দৃশ্যটি দেখবার মতো। গ্রামের লোকেরা সভয়ে বিস্ময়ে সাপটির দিকে তাকিয়ে আছে। বিশু বাগদী নিজেকে জাহির করে বলছে, এমন লম্বা, মোটা, ফণা তোলা ও গর্জন বিশিষ্ট গোখরো সাপ সে কখনও আগে দেখেনি।

প্রশ্ন ১২। "ক্রুদ্ধ বিষধর তার এ অনুরোধ রক্ষা করিল।" – ক্রুদ্ধ বিষধরটি কে? সে কার অনুরোধ কীভাবে রক্ষা করল?

Ans:- ক্রুদ্ধ বিষধর হল বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড গোখরো সাপ।

হারু ঘোষের মেজছেলে ন্যাপলাকে বিষধর গোখরো সাপ কামড় দিয়েছিল। এই সাপটিকে গ্রামের সাহসী যুবক বিশু বাগদী বল্লমবিদ্ধ করে ইঁটের গাদার ভেতর থেকে বের করে আনে। আগন্তুক বিষধর গোখরো সাপটিকে ধরবামাত্র সগর্জনে তার ডান হাতে ছোবল মারল। এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগন্তুক বাম হাতে সাপটিকে ধরলে সে তার বাম হাতে কামড় দিয়ে হাতখানি বেষ্টন করল। তখন আগন্তুক সাপটিকে বলেছিল: "রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও, চুমু দাও একটা আমাকে।" এ কথা বলার পর ক্রুদ্ধ বিষধর সাপটি তার এই অনুরোধ রক্ষা করল। তার গণ্ডদেশে একটা চুম্বন দেয় অর্থাৎ গণ্ডদেশে কামড় দিল।

প্রশ্ন ১৩। "সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নাই। উত্তেজিত জনতা কলরব করিতেছে। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুকের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।" – উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

Ans:- হারুঘোষের মেজছেলে ন্যাপলাকে বিষধর গোখরা সাপ কামড় মেরেছিল। তখন ডাক্তার এসে তিন-চারটে বাঁধন দিয়ে ঔষধ পত্তর লাগিয়ে দেয়। বিশু বাগদী নামে গ্রামের সাহসী যুবক সাপটিকে বল্লমবিদ্ধ করে ইঁটের গাদা থেকে বের করে আনে। তখন গাছের নীচে বসা আগন্তুকের কথা শুনে গ্রামের মানুষেরা মনে করে সে মস্ত গুণী ওঝা। তার কথা মতো ন্যাপলার ডাক্তারের দেওয়া বাঁধন খোলা হয় এবং বল্লমবিদ্ধ সাপকে ছাড়া হ। সাপটিতে আগন্তুক হাত দিয়ে ধরলে তাকে ডান-বাম হাত এবং কপালে কামড় মারে। এর ফলে আগন্তুকের মৃত্যু হয়। তখন সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নেই আগন্তুক ও ন্যাপলার মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে। কিন্তু সাটি নেই।

প্রশ্ন ১৪। "ভিড়ে যোগদান করে নাই" – কে? তার চেহারা ও প্রকৃতির বর্ণনা দাও।

Ans:- যে সাপটা হারু ঘোষের মেজ ছেলেকে কামড়েছিল তা ধরা পড়ায় গ্রামের লোক তাকে দেখতে ভিড় জমায়। একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় বসে জনৈক ব্যক্তি খানিকটা ছাতু খাচ্ছিল, সেই-ই ভিড়ে যোগদান করেনি।

লোকটির চেহারা অদ্ভুত, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, তেলহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন, গায়ে একটা ময়লা হাফপ্যান্ট এবং একটা ময়লা মতো ফতুয়া। খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়িতে ছাতু লেগে তার চেহারা আরও দৃষ্টিকটু হয়েছে। সে নিতান্ত নিরুৎসাহভাবে আপন মনে খাচ্ছিল। মানুষের জটলা সম্পর্কে তার এই উদাসীনতা তাকে এক অস্বাভাবিক ব্যক্তিরূপেই প্রতিপন্ন করে।

প্রশ্ন ১৫। "তৎক্ষণাৎ সাপটি গণ্ডদেশে একটা করাল চুম্বন অঙ্কিত করেছিল।" – কোন্ সাপটি কার গণ্ডদেশে কীভাবে করাল চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়েছিল?

Ans:- হারু ঘোষের মেজছেলে ন্যাপলাকে বিষধর গোখরো সাপ কামড় দিয়েছিল। এই সাপটিকে গ্রামের সাহসী যুবক বিশু বাগদী বল্লমবিদ্ধ করে ইঁটের গাদার ভেতর থেকে বের করে আনে। আগন্তুক বিষধর গোখরো সাপটিকে ধরবামাত্র সগর্জনে তার ডান হাতে ছোবল মারল। এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগন্তুক বাম হাতে সাপটিকে ধরলে সে তার বাম হাতে কামড় দিয়ে হাতখানি বেষ্টন করল। তখন আগন্তুক সাপটিকে বলেছিল : "রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও, চুমু দাও একটা আমাকে।" এ কথা বলার পর ক্রুদ্ধ বিষধর সাপটি তার এই অনুরোধ রক্ষা করল। তার গণ্ডদেশে একটা চুম্বন দেয় অর্থাৎ গণ্ডদেশে কামড় দিল।

প্রশ্ন ১৬। "একটু দূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জনৈক ব্যক্তি খানিকটা হাতু খাইতেছিল।" – লেখকের নাম উল্লেখ করে লোকটির চেহারার বর্ণনা দাও।

Ans:- লেখকের নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। পাঠের নাম 'দিবা দ্বিপ্রহর'। লোকটি পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা একটা পাগল। সে একটু দূরে একটা গাছের নিচে বসে ছাতু খাচ্ছিল। লোকটির চেহারা অদ্ভূত। খোঁচা খোঁচা গোফদাড়ি। তৈলবিহীন চুল আর আরক্ত নয়ন। সে জনতার ভিড়ে যোগদান করেনি।

প্রশ্ন ১৭। "ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না, কিৎসু হবে না – বলিয়া আগন্তুক সহাস্যে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল।" – আগন্তুক কে? তিনি কেন এবং কী প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?

Ans:- আগন্তুক হলো পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা এক পাগল।

গ্রামবাসী যখন সাপটাকে ভিড় করে আছে তখন পাশে একটি বৃক্ষের নিচে বসে এই আগন্তুকটি ছাতু খাচ্ছিল। কলরবে আকৃষ্ট হয়ে ভিড়ের দিকে এগিয় একজন লোককে ভিড়ের কারণ জিজ্ঞাসা করে। কারণ জেনে সে সহাস্যে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করে বলে ডাক্তারিতে কিছু হবে না, তার কথাবার্তাতে কুসংস্কারে বিশ্বাসী গ্রামবাসীরা মনে করে যে এক মস্ত বড় ওঝার আগমন হয়েছে এবং সে ন্যাপলাকে মন্ত্র পড়ে ঝাড়িয়ে সুস্থ করে তুলবে। কারণ তারা জানে যে সাপে কাটলে ওঝাই লাগে এবং একথাটাই আগন্তুক পাগল লোকটি গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছিল।

৩। ন্যাপলা: ন্যাপলা বনফুলের ‘দিবা দ্বিপ্রহরে’ ছোটগল্পে একটি চরিত্র। যাকে গোখরা সাপ কামড় দিয়ে ইঁটের গাদায় আত্মগোপন করেছিল। তাঁর পিতার নাম হারু ঘোষ। সে পিতার মেজছেলে।

৪। হারু ঘোষ: হারু ঘোষ বনফুলের ‘দিবা দ্বিপ্রহরে’ ছোটগল্পে একটি সাধারণ চরিত্র। তাঁর মেজছেলেকে গোখরা সাপ কামড় মেরে ইঁটের গাঁদায় আত্মগোপণ করেছিল। কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে একজন পাগলকে ওঝা বলে বিশ্বাস করায় তাঁর ছেলেটির মৃত্যু হয়।

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্ন ১। “লোকটির চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি, তৈল বিহীন রুক্ষ চুল।” – লোকটি কে? প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দাও।

Ans:- লোকটি হল পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা একটা পাগল। হারু ঘোষের মেজছেলেকে গোখরা সাপটি কামড় মেরে ইঁটের গাদার ভেতরে প্রবেশ করে তখন পাড়ার সাহসী যুবক বিশু বাগদী বল্লমবিদ্ধ করে ইঁটের গাদা থেকে সাপটিকে বের করে আনে। পাড়ার লোকেরা সাপটিকে দেখার জন্য ভিড় করে আছে। বিশু বাগদী সাপটি প্রসঙ্গে বলে এমন মোটা, লম্বা, সাপ সে পূর্বে আর কখনও দেখেনি। একটু দূরে গাছের নিচে বসে একজন লোক ছাতু খাচ্ছে। সে ভিড়ে যোগদান করেনি। লোকটির চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। তৈলবিহীন চুল, আর আরক্ত নয়ন। সে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসে।

প্রশ্ন ২। “পাগলা নয় কে? সব্বাইকে ধরে পাগলা-গারদে পুরুন আপনি হুজুর” – বক্তা কে? তাঁর এই বক্তব্যের কারণ কী? সংক্ষেপে আলোচনা করো। প্রশ্ন ৬। ‘বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল’ – আগন্তুক কে? জনতা তার কোন্ কার্যকলাপ রুদ্ধশ্বাসে দেখছিলো?(আগন্তুকটি হল একটি পাগল লোক। সে পাগলা গারদ হতে পালিয়ে এসেছে।)

Ans:- বক্তা বিশু বাগদী।

হারু ঘোষের মেজছেলে ন্যাপলাকে গোখরা সাপ দংশন করলে ডাক্তার এসে সেই ক্ষতস্থান কেটে কুটে ঔষধ দিয়ে বাঁধন দিয়ে যায়। কিন্তু পাড়ার লোকেরা পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা পাগলকে মস্ত গুণী ওঝা মনে করে তার কথামতো বাঁধন খুলে দেয়। পরে দেখা যায় পাগলটি বল্লমবিদ্ধ সাপটিকে ছেড়ে দিতেও বলে। ভীড়ের তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন। পরিধানে একটা ময়লা হাফ-পেন্ট এবং একটা ময়লা গেঞ্জির ফতুয়া। সে পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা একটি পাগল। ভিড়ের জনতা তার কথার ধরনে ভেবেছিল সে কোন মস্ত গুণী ওঝা।

প্রশ্ন ৭। “দ্রুতবেগে রটিয়া গেল, একজন মস্ত গুণী ওঝা আসিয়াছেন।” – ওঝাটি কে? তিনি কী করেছিলেন লেখো। /অথবা/ “দেখিবার মতো দৃশ্য বটে।” – দৃশ্যটি কী? সংক্ষেপে লেখো।

Ans:- ওঝাটি হল পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা একটি পাগল লোক।

পাড়ার সাহসী বালক বিশু বাগদী যখন বল্লমে গেঁথে সাপটিকে টেনে বের করেছে তখন সেখানে লোকের ভিড় জমে গিয়েছে। পাগল আগন্তুকটি ভিড়ের কলরবে আকৃষ্ট হয়ে সে দিকে এসে হাজির হয়ে জানল যে হারু ঘোষের ছেলে ন্যাপলাকে সাপটি কামড় দিয়েছে। সে বলল যে সে মন্ত্র পড়ে বিষ ঝাড়িয়ে নামিয়ে দেবে। এ কথা শুনে ন্যাপলাকে এখানে আনানো হল। তার কথা মতো ডাক্তারের দেওয়া ন্যাপলার পায়ের বাধন খুলে দেওয়া হলো। নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটি সাপটিকে ধরল। ধরা মাত্র সাপটি তার ডান হাতে ছোবল মারল। এতে একটুও বিচলিত না হয়ে সে বাম হাতে সাপটিকে ধরল। সাপটি লোকটির বামহাতে দংশন করল এবং বহু পাকে সমস্ত হাতটি বেষ্টন করল। পাগল লোকটি অদ্ভুত ভাবে হাসল এবং মৃত্যু বরণ করল।

প্রশ্ন ৮। “দারোগা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।” – এরপর কী হল?

Ans:- সারাদিনের এইসব রোমহর্ষক ঘটনার পর যখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই, উত্তেজিত জনতা কলরব করছে। হারু ঘোষের ছেলেও আগন্তুকের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে, সাপটিও চলে গেছে। ঠিক সে সময়ে পুলিশের দারোগা এসে আগন্তুকের মুখটা ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললেন যে তারা এই লোকটাকে খুঁজছিলেন। লোকটি একটি পাগল। পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। সাহসী বালক বিশু বাগদী বলল যে তারা সবাই পাগল। সবাইকে ধরে যেন পাগলা গারদে ঢুকানো হয়। অতঃপর অন্ধকার ঘনীভূত হলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

প্রশ্ন ৯। “সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নাই। উত্তেজিত জনতা কলরব করিতেছে। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুকের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।” – উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

Ans:- হারু ঘোষের মেজছেলে ন্যাপলাকে গোখরা সাপ কামড় মেরেছিল। তখন ডাক্তার এসে তিন-চারটে বাঁধন দিয়ে ঔষুধ-পত্তর লাগিয়ে দেয়। বিশু বাগদী নামে পাড়ার সাহসী বালক সাপটিকে বল্লমবিদ্ধ করে টেনে ইঁটের গাদা থেকে বের করে আনে। তখন গাছের নিচে বসা আগন্তুকের কথা শুনে গ্রামের মানুষেরা মনে করে সে মস্ত গুণী ওঝা। তার কথা মতো ন্যাপলার ডাক্তারের দেওয়া বাঁধন খোলা হয় এবং বল্লমবিদ্ধ সাপকে ছাড়া হয়। সাপটিকে আগন্তুক হাতে নিলে তাকে ডান, বাম এবং কপালে কামড় মারে। এর ফলে আগন্তুকের মৃত্যু হয়। তখন সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নেই। আগন্তুক ও ন্যাপলার মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে। কিন্তু সাপটি নেই।

প্রশ্ন ১০। “সিদ্ধ মনস্কাম বিশু বাগদী সগর্বে জাহির করিতেছে যে, এমন মোটা, এমন লম্বা, এমন ফণা ও গর্জন বিশিষ্ট গোক্ষুর সাপ সে আর কখনও দেখে নাই।” – বিশুবাগদী কে? উদ্ধৃতিটি বিস্তৃত করো।

প্রশ্ন ৭। 'ডাক্তারিতে কিছু হবে না, কিৎসু হবে না – বলিয়া আগন্তুক সহাস্যে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলটি উন্নত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল।' – উদ্ধৃতিটির উৎস উল্লেখ করে আগন্তুকের পরিচয় দাও, একটি বাক্যে।

Ans:- উদ্ধৃতিটি 'দিবা-দ্বিপ্রহরে' গল্পের। আগন্তুকটি হল জেল পলাতক একটি পাগল।

প্রশ্ন ৮। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে থাকার কারণ কী?

Ans:- হারু ঘোষের মেজছেলে ন্যাপলা এবং আগন্তুককে বিষধর গোখরা সাপ কামড় মেরেছিল। ফলে তারা মারা যায় এবং তাদের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে থাকে।

প্রশ্ন ৯। ডাক্তারবাবু সাপে কামড়ানো ন্যাপলাকে কীভাবে চিকিৎসা করেছিলেন?

Ans:- হারু ঘোষের মেজ ছেলে ন্যাপলাকে সাপে কামড় দিলে ডাক্তারবাবু সাপে দংশনের স্থানের উপরে তিন-চারটে বাঁধন দিয়ে কাটা-চিরা করে ওষুধ পত্তর লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১০। 'তিক্ত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, পাগল নয় কে? সব্বাই কে ধ'রে পাগলা গারদে পুরুন আপনি।' – উক্তিটি কার এবং কোন পাঠের অন্তর্গত?

অথবা,

কে কাকে একথা বলেছে?

Ans:- উক্তিটি পাড়ার সাহসী ছেলে বিশু বাগদী থানার দারোগাকে বলেছে। উক্তিটি 'দিবা দ্বিপ্রহরে' পাঠের।

প্রশ্ন ১১। 'গোখরা সাপটা আজ সকালে ন্যাপলাকে কামড়েছিল।' – ন্যাপলা কে? সাপটা কি বিষাক্ত ছিল?

Ans:- ন্যাপলা জনৈক হারু ঘোষের মেজ ছেলে। হ্যাঁ, সাপটা বিষাক্ত ছিল।

প্রশ্ন ১২। "বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে।" – বিষধর সাপটিকে কে বল্লমবিদ্ধ করেছিল? এর আগে সকালের দিকে সাপটি কাকে দংশন করেছিল?

Ans:- পাড়ার সাহসি বালক বিশু বাগচি। সকালে হারু ঘোষের মেজ ছেলে ন্যাপলাকে সাপে দংশন করেছিল।

প্রশ্ন ১৩। "বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে।" – বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধরটি কী? তাকে কে বল্লমবিদ্ধ করেছে?

Ans:- প্রকাণ্ড বিষধরটি হলো একটি গোখরো সাপ। বিশু বাগদী নামে পাড়ার এক সাহসী যুবক তাকে বল্লমবিদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ১৪। "একেই তো আমরা খুঁজছি" – খুঁজ পেয়েও তাকে কেন ধরতে পারেন নি?

Ans:- যখন আগন্তুকের খোঁজ পেলেন তখন সে গোখরো সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে। তাই খোঁজ পেয়েও তাকে ধরা হল না।

প্রশ্ন ১৫। 'রাগ করছ কেন' – কার প্রতি কার উক্তি?

Ans:- গোখরা সাপের প্রতি আগন্তুকের উক্তি।

প্রশ্ন ১৬। 'বিষধর তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল' – কে কার অনুরোধ কীভাবে রক্ষা করে?

Ans:- বিষধর গোখরোর প্রতি আগন্তুক একটি চুমু দেবার অনুরোধ করলে গোখরা সাপটি তার গলায় একটি মরণ চুমু দিয়ে সে অনুরোধ রক্ষা করে।

প্রশ্ন ১৭। 'এখানে এত ভিড় কিসের?' প্রশ্নটি কে কাকে করেছিল?

Ans:- আগন্তুক পাগল ভিড়ের মধ্যে থাকা জনৈক ব্যক্তিকে প্রশ্নটা করেছিল।

প্রশ্ন ১৮। 'মন্তর ঝাড়ব আর উঠে বসবে' – বক্তা কে? মন্তর কী?

Ans:- বক্তা হলেন আগন্তুক। মন্তর শব্দের অর্থ মন্ত্র।

প্রশ্ন ১৯। "একেই তো আমরা খুঁজছি" – বক্তা কে? কাকে খুঁজছিলেন এবং কেন?

Ans:- বক্তা হলেন দারোগা সাহেব। তিনি আগন্তুককে খুঁজছিলেন। কারণ আগন্তুকটি পাগল ছিল। সে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছিল।

প্রশ্ন ২০। বনফুলের প্রকৃত নাম কী? তাঁর যে কোনো একটি উপন্যাসের নামোল্লেখ করো।

Ans:- বনফুলের প্রকৃত বা আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম হলো 'তৃণখণ্ড'।

টীকা লেখো:

১। বিশু বাগদি: বিশু বাগদী হলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটির একটি চরিত্র। সে গ্রামের এক সাহসী যুবক। ইঁটের গাদায় লুকিয়ে থাকা সাপটির লেজ দেখতে পেয়ে বল্লমবিদ্ধ করে সেখান থেকে বের করে আনে সে।

২। আগন্তুক: আগন্তুক শব্দের অর্থ নবাগত লোক অর্থাৎ অপরিচিত হঠাৎ আগত কোনো লোক। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পের প্রধান চরিত্র আগন্তুক। সে পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা আগন্তুক। তাঁর চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, তৈলবিহীন রুক্ষচুল, আরক্ত নয়ন। পরিধানে একটা ময়লা হাফ-প্যান্ট এবং একটা ময়লাগোছের ফতুয়া।

ছন্দের প্রকার বা শ্রেণীবিন্যাস: বাংলা ভাষার ছন্দকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা- (ক) তান-প্রধান ছন্দ; (খ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দ; এবং (গ) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ। তান-প্রধান ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, ধ্বনি-প্রধান ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা হয়।

প্রশ্ন 2 অক্ষরবৃত্ত বা তান-প্রধান ছন্দের লক্ষণগুলি উল্লেখ কর এবং একটি উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) দাও।

উত্তর। যে ছন্দের মধ্যে তান বা একটানা সুরের প্রবাহ প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে তাকে তান-প্রধান ছন্দ বলে; যথা-

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

তান-প্রধান ছন্দের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য: তান-প্রধান ছন্দের প্রধান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) তান-প্রধান ছন্দে স্বরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বিচার করা হয় না।
খ) এই প্রকার ছন্দে প্রতিটি অক্ষরই এক মাত্রার।
(গ) তান-প্রধান ছন্দে যুক্তাক্ষর বহুল এবং যুক্তাক্ষর বর্জিত উভয় প্রকার চরণই ব্যবহার করা হয়।
(ঘ) এই প্রকার ছন্দে অক্ষর ধ্বনির অপেক্ষা সুরের প্রবাহ চরণের মধ্যে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে।
(ঙ) তান-প্রধান ছন্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের যেমন সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে, তেমনই যুগ্ম ধ্বনিতেও সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে।
(চ) এই প্রকার ছন্দে তান-প্রবাহের জন্য লঘু-গুরু অক্ষরের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।
(ছ) তান-প্রধান ছন্দে তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার করা যায়।
(জ) তান-প্রধান ছন্দ সাধারণত পয়ারের ভিত্তিতেই রচিত হয়।
(ঝ) একটানা সুরের প্রবাহ তান-প্রধান ছন্দের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
(ঞ) এই প্রকার ছন্দেংঃ ৎ প্রভৃতিকে অক্ষর বা মাত্রা গণনার বাইরে রাখা হয়।
(ট) এই ছন্দের শোষণশক্তি আছে। যুক্ত ও সরল অক্ষর সবই এক মাত্রার

প্রশ্ন ৩. ধ্বনি-প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষণগুলি উল্লেখ কর এবং একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর। যে ছন্দে পঙক্তির পর্বগুলিতে অক্ষর ধ্বনি বিশেষরূপে প্রাধান্য পায় তাকে ধ্বনি-প্রধান ছন্দ বলে ধ্বনি-প্রধান ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরকে দুই মাত্রার ধরা হয় এবং অন্যান্য সমস্ত অক্ষর এক মাত্রীর হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে চার মাত্রার পর্ব উল্লেখ করা হল:

পাষাণের। স্নেহধারা। তুষারের। বিন্দু।
ডাকে তোরে। চিতলোল। উতরোল। সিন্ধু।

ধ্বনি-প্রধান ছন্দের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য: ধ্বনি-প্রধান ছন্দের প্রধান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) ধ্বনি-প্রধান ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ বলিয়া যৌগিক অক্ষরকে দুই মাত্রার ধরা হয়।
(খ) কোনো কোনো সময় মৌলিক স্বরও দুই মাত্রায় হতে পারে।
(গ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব স্বরটি দুই মাত্রার হয়।
(ঘ) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রার হয়।
ঙ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দে বিশেষ পর্ব ও সাধারণ পর্ব-এই দুই প্রকার পর্ব থাকে। (
(চ) এই ছন্দ সর্বদাই গীতিধর্মী।
(ছ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দের শোষণশক্তি নেই।
(জ) এই প্রকার ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়।
ঝ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দ দুর্বল হওয়ার ফলে বেশিমাত্রায় পর্ব ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।
(ঞ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দে উচ্চারিত ধ্বনির পরিমাপই প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন ৪। স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের লক্ষণগুলি উল্লেখ কর এবং

উত্তর। (যে ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথমে একটি করে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পড়া তাকে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বলে) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে ছড়া রচিত হয় পড়ে একে ছড়ার ছন্দ এবং লৌকিক ছন্দ নামেও অভিহিত করা যায়। গ্রামবাংলার ছড়া, বিশেষত ছেলেভুলানো ছড়া, শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দকে ভিত্তি করেবাংলার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বহুলপ্রচলিত একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে-

বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদে এল। বান।
শিব ঠাকুরের। বিয়ে হলো। তিন কন্যা। দান।।
এক কন্যা। রাঁধেন বাড়েন। আরেক কন্যা। খান।
আরেক কন্যা। গোসা করে। বাপের বাড়ী। যান ।।

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য: শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের প্রধান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

প্রশ্ন ১৮। "ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না, কিৎসু হবে না" কথাটি কে বলেছে? তোমার নিজের ভাষায় প্রসঙ্গটি বিবৃত করো।

Ans:- আগন্তুক হলো পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা এক পাগল।

গ্রামবাসী যখন সাপটাকে ভিড় করে আছে তখন পাশে একটি বৃক্ষের নিচে বসে এই আগন্তুকটি ছাতু খাচ্ছিল। কলরবে আকৃষ্ট হয়ে ভিড়ের দিকে এগিয় একজন লোককে ভিড়ের কারণ জিজ্ঞাসা করে। কারণ জেনে সে সহাস্যে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করে বলে ডাক্তারিতে কিছু হবে না, তার কথাবার্তাতে কুসংস্কারে বিশ্বাসী গ্রামবাসীরা মনে করে যে এক মস্ত বড় ওঝার আগমন হয়েছে এবং সে ন্যাপলাকে মন্ত্র পড়ে ঝাড়িয়ে সুস্থ করে তুলবে। কারণ তারা জানে যে সাপে কাটলে ওঝাই লাগে এবং একথাটাই আগন্তুক পাগল লোকটি গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছিল।

প্রশ্ন ১৯। "একেই তো আমরা খুঁজছি।" – বক্তা কে? কাকে খুঁজছিলেন এবং খোঁজ পেয়েও তাকে কেন ধরতে পারেন নি?

Ans:- এখানে বক্তা থানার পুলিশের দারোগা। তিনি পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা এক পাগলকে খুঁজছিলেন। তিনি যখন পাগলটির খোঁজ পেয়েছিলেন তখন সব খলা শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই পাগলটি সাপের ওঝা সেজে যখন সর্পাঘাতে আহত হারুঘোষের মেজ ছেলে নেপলাকে ভালো করতে লেগেছিল তখন পরপর সর্বের ছোবলে সেও পটল তুলে ছিল, তাই দারোগাবাবুর পালানো পাগলটাকে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্ন ১। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটি তোমার নিজের ভাষার লেখো।//প্রশ্ন ২। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মানুষকে যে কত দুর্ভোগ ও বিপদে ফেলতে পারে 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পটির মধ্য দিয়ে বনফুল সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন। – আলোচনা করো।

অথবা,

'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পে বনফুল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ফলে মানুষের দুর্ভোগের যে ছবি এঁকেছেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

Ans:- আজ সকালে হারু ঘোষের মেজ ছেলে ন্যাপলাকে একটি বিষধর সর্প কামড় মেরে ইঁটের গাদার ভেতরে লুকিয়ে পড়ে। সাপটিকে খুঁজে বের করতে গিয়ে দুপুর হয়ে পড়ে। সে সময় সাধারণত লোকজন বিশেষ কোনো কাজ না থাকলে বাইরে বেরোয় না, কিন্তু সেদিন ন্যাপলাকে কামড় দেওয়া বিষধর সাপটিকে দেখার জন্য দুপুরের প্রখর রৌদ্রের তাপ সহ্য করেও মানুষ ভিড় বেঁধে আছে। বিশু বাগদী নামক পাড়ার সাহসী এক যুবক ইঁটের গাদার ভিতরে সাপটির লেজ দেখতে পেয়ে লেজে বল্লমবিদ্ধ করে সাপটাকে বাহিরে টেনে আনে। বল্লমবিদ্ধ সাপটি ফণা তুলে তর্জন-গর্জন করছে। তা দেখবার মতো দৃশ্য। জনতা সভয়ে সাপটির দিকে তাকিয়ে আছে। বিশু বাগদি বলেন এমন মোটা, লম্বা, ফণা ও গর্জন বিশিষ্ট সাপ সে আগে আর দেখেনি। গ্রামবাসী যখন সাপটিকে দেখার জন্য ভিড় করে আছে তখন একটি গাছের নিচে বসে জনৈক আগন্তুক ছাতু খাচ্ছিল। সে আসলে পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে আসা পাগল। পরে একটি চিৎকারে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে জিজ্ঞেস করে সে জানতে পারে যে হারু ঘোষের মেজ ছেলে ন্যাপলাকে সাপে কেটেছে।

ডাক্তার এসে ক্ষত স্থানে কেটে কুটে ওষুধ পত্তর দিয়ে বেঁধে যায়। তখন আগন্তুক বলে, ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না। সমস্ত গ্রামে রটে যায় মস্ত বড় গুণী ওঝা এসে হাজির হয়েছে। তখন হারু ঘোষকে খবর দেওয়া হল। আগন্তুকের কথা মতো ন্যাপলার বাঁধন খোলা হয় এবং বল্লমবিদ্ধ সাপটিকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। সাপটি আগন্তুকের দুহাত ও গলায় দংশন করে। এতে আগন্তুক মারা যায়। উত্তেজিত জনতার কলরব; ন্যাপলা ও আগন্তুকের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে।

দারোগা এসে আগন্তুকের মুখটি নিরীক্ষণ করে বললেন, একেই তো তারা খুঁজছিলেন। তারপর তিনি বলেন যে, সে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা পাগল। তখন বিশু বাগদী একথা শুনে বলেন যে, এখানে সবাই পাগল। সবাইকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হোক। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

ছন্দ

প্রশ্ন১ ছন্দ কাকে বলে ? ছন্দের সংজ্ঞা দাও। ইহার স্বরূপ বর্ণনা কর। ছন্দ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর। 'ছন্দ' হল কবিতা ও কাব্যের একটি ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য। কবিতায় 'ছন্দ' একটি স্বাভাবিক অংশ। ছন্দের মধ্যে থাঁকে সুরের স্পন্দন ও সুরের ঝংকার। এই দূরে ঝংকারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে। আমরা আমাদের মনোভাবকে গদ্যে এবং পদ্যে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু গদ্য হৃদয়ে তেমন স্পন্দন বা আলোড়ন তোলে না। উদাহরণস্বরূপ বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে–গগনে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। একা একা কলে বসে আছি। এই বাক্যসমূহ আমাদের মনে কোনো স্পন্দন সৃষ্টি করে না। কিন্তু কবি যখন ছন্দ সহযোগে বলেন–

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা"

তখন মনের মধ্যে আনন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে। অপূর্ব পুলক জাগে। সুরের স্পন্দন আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। সুরের এই স্পন্দনই হল 'ছন্দ'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর ছাড়া পায়। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার। কথার সুরকে সে নাড়া দিয়ে থাকে।" ছন্দোবদ্ধ বাক্যই হল কাব্য- সেই বাক্য রসাত্মক কাব্য।

“মধুহীন কর না গো তব মনঃ কোকনদে।’’ -মধুসূদন দত্ত

এখানে 'মধু' শব্দের দুইটি অর্থ-(১) মধু-কবি মধুসূদন; (২) মধু- মকরন্দ।

(ঘ) ব্যাজস্তুতি : ব্যাজস্তুতি একটি গূঢ়ার্থ মূল অর্থালঙ্কার। নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতি দ্বারা নিন্দা প্রতীয়মান হলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। ব্যাজ অর্থ-ছল, কপট। ব্যাজস্তুতি দুই প্রকার; যথা- (অ) নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা; (আ) প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা।

নিন্দাচ্ছলে প্রশংসায় সাধারণ অর্থে নিন্দা বোঝায়, এবং গূঢ় অর্থে প্রশংসা বোঝায়; যথা-

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ"।

এখানে নিন্দাচ্ছলে প্রশংসাই বোঝানো হচ্ছে।

(চ) উৎপ্রেক্ষা : বর্ণনীয় বিষয়ে যদি উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদরূপে সংশয় ঘটে, এবং সংশয়ে যদি উপমান পক্ষই প্রবল হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। 'উৎপ্রেক্ষা' শব্দের অর্থ-বিতর্ক, সংশয় বা সম্ভাবনা; যেমন-মুখ যেন চাঁদ।

এখানে প্রবল সাদৃশ্যের ফলেই উপমেয়কে (মুখ) উপমান (চাঁদ) বলে সংশয় হয়েছে। বুঝি, যেন, মনে হয়, মনে গণি প্রভৃতি সম্ভাবনাবাচক শব্দ দ্বারা সংশয় বা বিতর্ক প্রকাশিত হয়।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার; যথা- (অ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, ও (আ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(অ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা: যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে যেন, বুঝি, মনে হয় প্রভৃতি সম্ভাবনাবাচক শব্দ প্রয়োগ করে উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয়
প্রকাশ করা হয় তাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে; যেমন-

ফেনিল সলিল রাশি বেগভরে পড়ে আসি।
চন্দ্রালোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে।

অর্থাৎ ফেনিল শ্বেতবর্ণ জলরাশি বেগে এসে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন
চন্দ্রালোক ভেঙে এসে পৃথিবীতে পড়ছে।

(আ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা: উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে যেন, জনু, মনে হয় প্রভৃতি সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, অনুমানের দ্বারা সম্ভাবনার ভাবটি
বুঝে নিতে হয় তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলে; যেমন-

কাজল কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আঁচিল মাঝে শোভে তারাগণ।।

অর্থাৎ নয়ন কাজলের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে, মনে হচ্ছে মেঘের
আঁচিলের মধ্যে তারাগুলি শোভা পাচ্ছে।

(ছ) রূপক: রূপক একটি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার। বর্ণনীয় বিষয়ে উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদ আরোপ করা হলে রূপক অলঙ্কার হয়। বলা বাহুল্য, এই অভেদ কাল্পনিক। রূপক শব্দের অর্থ রূপবান, মূর্ত। তা হতে প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতিও হয়। এই অর্থ লক্ষ করেই আলঙ্কারিকেরা বলেন, রূপক হচ্ছে রূপের আরোপ। এই আরোপে উপমেয়কে অস্বীকার করা হয় না, তাকে স্বীকার করা হয়। তবে অপ্রধান করে আক্ষিপ্ত বস্তু বা উপমানকে প্রধান করা হয়। রূপকালঙ্কারে একমাত্র উপমানের ধর্ম প্রকাশ পায়; যেমন-

"মুখচাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায়।"

এখানে মুখ স্বীকৃত হয়ে আরোপের ফলে চাঁদের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এবং একমাত্র বর্ণিত হয়েছে। জ্যোৎস্না ছড়ানো তাই অলঙ্কার এখানে রূপক।

“দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মরিল।“

এখানে উপমেয় 'দুঃখ' উপমান আগুনকে অনুসরণ করছে। সুতরাং এটি রূপকালঙ্কার।

(ঝ) বিষম : বিষম একটি বিরোধমূলক অলঙ্কার। বিষম অর্থাৎ বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের বর্ণনা-বিশেষ হতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হলে বিষম অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি দেখা দেয় অথবা কারণ হতে যে ফল পাবার কথা তার পরিবর্তে যদি অবাঞ্ছিত ফল দেখা দেয় অথবা যদি দুইটি অসম্ভব ঘটনার মিলন ঘটে তবে বিষম অলঙ্কার হয়; যেমন-

জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশি।
বিধির বিপাকে তাহা হয়ে উঠে বিষ।।

অর্থাৎ দেহে চন্দন লেপনের ফল হল দেহে শীতলতা। কিন্তু এখানে বিধির বিপাকে চন্দন লেপনের ফলে বিষের জ্বালা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং আশানুরূপ ফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফল হওয়ায় এটি বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

বিষম অলঙ্কার তিন প্রকার। কারণ ও কার্যের কারণ বা ক্রিয়া পরপর বিরুদ্ধ হলে প্রথম প্রকার বিষম; আরদ্ধ কার্যের বৈফল্য এবং নূতন অনর্থের উৎপত্তি হলে দ্বিতীয় প্রকার বিষম; এবং পরস্পর বিরুদ্ধ একত্র সংঘটন হলে তৃতীয় প্রকার বিষম অলঙ্কার হয়।

(চ) পর্বাঙ্গ: পর্বাঙ্গ শব্দের অর্থ পর্বের অঙ্গ বা অংশ। পর্ব + অঙ্গ = পর্বাঙ্গ। 'পর্বাঙ্গ' বলতে পর্বের অন্তর্গত পৃথক শব্দকে বোঝায়। কয়েকটি পর্বাঙ্গ মিলে একটি পর্ব গঠিত হয়; অর্থাৎ একটি পর্বের মধ্যে অনেকগুলি পর্বাঙ্গ থাকতে
পারে। যেমন-

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১.
সকাল: বেলা। কাটিয়া গেল। বিকাল: নাহি। যায়

এখানে প্রতিটি পর্বে দুইটি করে পর্বাঙ্গ আছে। শেষের পর্বটি অসম্পূর্ণ পর্ব। সুতরাং সেখানে একটিমাত্র পর্বাঙ্গ আছে।

প্রশ্ন১। অলঙ্কার কাকে বলে? অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর; সৌন্দর্য মানেই অলঙ্কার। অলঙ্কার হল কাব্য- শ্রী। এটি কাব্যতরুর কুসুম, শব্দার্থ-রূপ শাখায় শাখায় প্রস্ফুটিত হয়ে সার-ভূত বস্তুরূপেই কাব্যতরুর শোভা সম্পাদন করে।

সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের অর্থ 'ভূষণ'। সুতরাং অলম্ বা ভূষণ করা হয় যা দ্বারা, তাই অলঙ্কার। অলঙ্কার শব্দের ব্যাপক অর্থ সৌন্দর্য অর্থাৎ কাব্য-সৌদয়া যা দ্বারা, রস, ধ্বনি, গুণ, রীতি অথবা অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি

অলঙ্কারের শ্রেণীবিন্যাস: অলঙ্কারকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা- (ক) শব্দালঙ্কার, ও (খ) অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার: শব্দ অথবা ধ্বনির সাহায্যে যে অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে; যেমন-

চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ
কোথা চম্পক আভরণ। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে 'চ' বর্ণটি বাক্যে বহুবার ব্যবহৃত হওয়ায় অপূর্ব ধ্বনি-মাধুর্য সঞ্চার করেছে।

অর্থালঙ্কার: যেখানে অর্থের সাহায্যে অর্থাৎ অর্থের বৈচিত্র্য উৎপাদনের দ্বারা অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয় তাকে অর্থালঙ্কার বলে; যেমন-

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।

এখানে 'কানুর পিরীতি' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রেমকে চন্দনের সঙ্গে তুলনা করে অর্থগৌরবের সৃষ্টি করা হয়েছে, এইজন্য এটি অর্থালঙ্কার।

প্রশ্ন ২। নিম্নলিখিত অলঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দাওঃ

উত্তর। **(ক) অনুপ্রাস**: একই বাক্যে অদূরবর্তী বিভিন্ন শব্দে একটি বা একাধিক বর্ণের আবৃত্তি হলে যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তার নাম অনুপ্রাস অলঙ্কার। বর্ণের আবৃত্তি অর্থ বর্ণের একাধিকবার উচ্চারণ-বর্ণ-সাম্য বা বর্ণ-সাদৃশ্য; যেমন-

চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ কোথা চম্পক আভরণ।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে 'চ' এই ব্যঞ্জনটি বহুবার উচ্চারিত হওয়ায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। এবং 'চরণ', 'বিচরণ' ও 'আভরণ' এই তিনটি শব্দে 'র, ণ' বর্ণগুচ্ছ একাধিকবার উচ্চারিত হওয়ায় অনুপ্রাস হয়েছে।

অনুপ্রাস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে; যথা- (অ) বৃত্ত্যনুপ্রাস; (আ) অন্ত্যানুপ্রাস;(ই) শ্রুত্যানুপ্রাস; (ঈ) ছেকানুপ্রাস।

(গ) শ্লেষ :একটি বাক্যে একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে যদি একাধিক অর্থ প্রকাশ করে তবে শ্লেষ অলঙ্কার হয়। 'শ্লেষ' শব্দের অর্থ আশ্লেষ-সংযোগ, আলিঙ্গন। বাক্যে শব্দটি যেমন পাশাপাশি দুইবার প্রযুক্ত হয়েছিল, পরে একরূপতাহেতু আলিঙ্গিত বা মিলিত হয়ে এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অর্থ বিভিন্নই রয়েছে। তাই শ্লেষে একবার মাত্র প্রয়োগ কিন্তু অর্থ ভিন্ন; যেমন-

"বামন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান।" -প্রবাদ

এখানে দক্ষিণা (১) পুজা সমাপ্তির পর প্রাপ্য অর্থ; (২) দক্ষিণা বাতাস। পুবে হাওয়ার বাদল, ও তজ্জনিত বান হয়। দক্ষিণা বাতাস বইলেই বাদল ছেড়ে যায় ও বান চলে যায়।

"শ্লেষ দুই প্রকার

(অ) সভঙ্গ শ্লেষ, ও (আ) অভঙ্গ শ্লেষ।

(অ) সভঙ্গ শ্লেষ : শব্দকে যখন ভেঙে তার দুইটি অর্থ বের করা হয় তখন তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে।

"পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ।"

এখানে 'পৃথিবী' ও 'টা' বিশ্লেষিত করে 'টা'-র সঙ্গে কার যোগে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সভঙ্গ শ্লেষ। বাংলায় একে হেঁয়ালি বলে ধরা হয়।

(আ) অভঙ্গ শ্লেষ : এই প্রকার শ্লেষ অলঙ্কারে শব্দটিকে না ভেঙেই একাধিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়; যেমন-

(ক) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে প্রত্যেক পর্বের প্রথমে একটি করে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পড়ে।
(খ) এই প্রকার ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরকে এক মাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়।
(গ) শ্বাসাঘাত ছন্দে রচিত কবিতার শব্দের ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর হ্রস্ব হয়ে এক মাত্রার হয়।
(ঘ) এই প্রকার ছন্দের লয় দ্রুত হয়। প্রায় প্রতিটি পর্বেই অন্তত একটি শ্বাসাঘাত পড়ে।
(ঙ) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে কেবলমাত্র এক ধরনেরই পর্ব থাকে।
(চ) এই প্রকার ছন্দে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকার জন্য সমস্ত যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব অর্থাৎ এক মাত্রার হয়।
(ছ) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ছাঁচ সম্পূর্ণরূপে বাঁধাধরা। এই কারণে এই ছন্দে মূল শব্দকে ভেঙে দুইটি পর্বাঙ্গে বিভক্ত করা যায়
(জ) এই প্রকার ছন্দে স্বরধ্বনি পরিমিত সংখ্যার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।
(ঝ) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ নদীমাতৃক বাংলাদেশের ঘরোয়া ছন্দ।
(ঞ) একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৫। সংজ্ঞা লেখ: (ক) অক্ষর, (খ) মাত্রা, (গ) যতি, (ঘ) ছেদ, (ঙ) পর্ব, (চ) পর্বাঙ্গ

উত্তর। **(ক) অক্ষর:** সাধারণভাবে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ বোঝানো হয়। কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষর একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। বাংলায় অক্ষর বলতে বর্ণই বোঝায়। বাগযন্ত্রের সামান্য চেষ্টায় যে ধ্বনি সৃষ্ট হয় বাংলায় তাকে 'অক্ষর' বলা হয়। এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, স্বরধ্বনি ছাড়া অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে না। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে হলে স্বরধ্বনির সাহায্যের প্রয়োজন। ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হলেও সব স্বরধ্বনিই অক্ষর; যেমন–অ, আ, ই, ক, খ, গ প্রভৃতি। অক্ষর দুই প্রকার; যথা–স্বরান্ত ও হলন্ত।

(খ) মাত্রা: বাংলা ছন্দ সম্পূর্ণরূপে মাত্রাগত। দৈর্ঘ্যের পরিমাপ; যেমন–ইঞ্চি, ফুট, মিটার, কিলোমিটার প্রভৃতির দ্বারা করা হয়, সেইরূপ ছন্দ বিচার করতে হলে মাত্রার গণনা করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, যার দ্বারা ধ্বনির পরিমাপ করা যায় তাকে মাত্রা বলে। বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। কোন অক্ষর কত মাত্রার তা পূর্ব নির্ধারিত নয়। একই অক্ষর কোথাও এক মাত্রার আবার কোথাও দুই মাত্রার হতে পারে।

'আলোর নাচ'-এই শব্দগুচ্ছে তিনটি অক্ষর আছে–আলোর নাচ। এর মধ্যে 'আ' ও 'না' স্বরান্ত। 'লোর' ও 'নাচ' হলন্ত। স্বরান্ত অক্ষর এক মাত্রা এবং শব্দের শেষে হলন্ত অক্ষর থাকলে দুই মাত্রা। এইভাবে বিচার করলে 'আলোর নাচ' পাঁচ মাত্রার।

(গ) যতি: কবিতায় এক ধরনের বিরতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে যতি বলা হয়। 'যতি' প্রকৃতপক্ষে 'ক্ষণিক বিরতি'। অর্থাৎ নিঃশ্বাস- প্রশ্বাসগত বিরতি হল যতি। একটানা কোনো কিছু পড়া বা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্বাস গ্রহণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মধ্যে আমাদের থামতে হয়। শ্বাস- প্রশ্বাসগত এই বিরামকেই যতি বলে। কবিতার একটি পঙ্ক্তিতে চরণের যতখানি এক-একটি ঝোঁকে উচ্চারিত হয় এবং সেই উচ্চারণের শেষে যে বিরতি ঘটে, তাকেই যতি বা ছন্দোযতি বলে।
যতি দুই প্রকার; যথা–অর্ধ যতি ও পূর্ণ যতি।

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল / ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ / কে বট আপনি।।

এখানে একটি দাঁড়ি চিহ্ন (।) দ্বারা অর্ধযতি এবং দুইটি দাঁড়ি চিহ্ন (।।) দ্বারা পূর্ণযতি নির্দেশ করা হয়েছে।

(ঘ) ছেদ: বাংলায় ছেদ বলতে অর্থগত বিরতিকে বোঝায়। আমরা একসঙ্গে বেশিক্ষণ একটানা কথা বলতে পারি না। একটানা বিরতিহীন কথা বললে শ্রোতার কাছে বিরক্তিকর ও শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। এইজন্য গদ্য বা পদ্য, যাই আমরা পড়ি না কেন, মাঝে মাঝে থেমে থেমে উচ্চারণ করতে হয়। কথার মাঝে তার স্বল্পক্ষণ থামলে চলে, কিন্তু যখনই কথাটি শেষ হয়ে যায়, তখনথার মাঝে এমতে হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকেই 'ছেদ' বলা হয়। ছেদ অর্থনির্ভর হবেশি ক্ষমা অর্থাৎ বাক্যের অর্থ অনুযায়ী কবিতার চরণে ছেদ পড়ে। ছেদ দুই প্রকার; যথায়; অর্থচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ। কোন চরণের যে অংশে প্রথম থামতে হয় তাকে অর্ধচ্ছেদ এবং যেখানে একটি চরণ শেষ হওয়ার জন্য থামতে হয়, তাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে; যেমন–

আজ তুমি কবি শুধু। নহ আর কেহ।
কোথা তব রাজসভা। কোথা তব গেহ।।

এখানে 'শুধু' ও 'রাজসভা'র পর অর্ধচ্ছেদ পড়েছে এবং 'কেহ' ও 'গেহ'র পর পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে।

(ঙ) পর্ব: বাংলায় পর্ব বলতে সাধারণত কয়েকটি শব্দের সমষ্টিকে বোঝায়। কবিতার চরণ যতি দ্বারা ভাগ করা হয়। এই যতির বিভাগকে 'পর্ব' বলে; অর্থাৎ এক যতি হতে অন্য যতি পর্যন্ত শব্দসমষ্টিকে পর্ব বলে। সহজ ভাষায় বলা যায় এক শ্বাসে যতটুকু বলা হয় তাই পর্ব।
যেমন–সকালবেলা। কাটিয়া গেল। বিকাল নাহি। যায়।
এখানে, সকালবেলা–পর্ব; কাটিয়া গেল–পর্ব; বিকাল নাহি–পর্ব; এবং যায়–অসম্পূর্ণ পর্ব।